রবীন্দ্রস্মৃতি

বাল্মীকির বেশে রবীন্দ্রনাথ

১৮৮১ সালে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়

রবীন্দ্রস্মৃতি

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিকথা রচিত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সোৎসাহ প্ররোচনায় এর উৎপত্তি ও কল্যাণীয় শ্রীমান শুভময় ঘোষের সযত্ন অনুলিখনে এর পরিসমাপ্তি। প্রায় পৌনে শতাব্দীর স্মৃতির জটিল জালকে সংগীতস্মৃতি নাট্যস্মৃতি সাহিত্যস্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

শান্তিনিকেতন

বৈশাখ ১৩৬০

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

আলোকচিত্র

উইলিয়াম আর্চার -অঙ্কিত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

সূচনা

কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যে ভাবে দেখে বা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তাঁর ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটোখাটো ইঙ্গিত জানতে পায় যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়মাত্রেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই ছোটোখাটো পরিচয়খণ্ডগুলি একত্র করে এই স্মৃতিপটে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিষয়গুণেই ভবিষ্যৎ পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে বলে আশা করি। তাঁকে যাঁরা দেখেন নি তাঁর নানা বয়সের ছবির দ্বারা সে অভাব কতকটা পূরণ করা হয়েছে, আর তাঁকে যাঁরা জানেন নি তাঁরা এই ছোটোখাটো বর্ণনাগুলি একত্র করে তাঁর প্রকৃতিরও আংশিক একটি ছবি বোধ হয় মনশ্চক্ষে গড়ে তুলতে পারবেন। এই রকম অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়েই ব্যক্তিত্ব নামক দুর্জ্ঞেয় পদার্থের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। যদিও বিরাট ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টভাবে ধরতে-ছুঁতে পারা সহজ কাজ নয় এবং আমার মতো মনস্তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অতি সাধারণ ব্যক্তিকে যখন অতি কাছ থেকে দেখেও বোঝা শক্ত মনে হয় তখন অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা অনেক দূরের কথা— পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মতো। একই ব্যক্তির মধ্যে অনেক ব্যক্তি বাস করে, এ কথাটা কে বলেছেন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না এমন বলতে পারি নে।

আমাদের স্তরের মধ্যে প্রচলিত স্নেহ দয়া মায়া মমতা অনুরাগ বিরাগ শোক আনন্দ প্রভৃতি মনোভাবগুলি যেভাবে প্রকাশ পায় তাতেই আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং, অপর কোনো ব্যক্তিতে যদি সেই প্রকাশের ব্যতিক্রম দেখি তখন মনে হয় সে বেদনাবোধই বোধ হয় তাঁর নেই। রবিকাকা সাধারণভাবে শোকপ্রকাশ করতেন না বলে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনাবোধ কম ছিল, এ কথা কেউ কেউ মনে করতেন শুনেছি। কিন্তু আগেই বলেছি আমি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ নই; সুতরাং বিচার করতেও সক্ষম নই। কবি নিজেই

বলেছেন— 'আপন মন যদি বুঝিতে নারি, পরের মন বুঝে কে কবে।' তিনি নিজের সব কথাই নিজে বলে গেছেন, আমাদের বলবার কিছু বাকি রাখেন নি। মনে আছে, মা ঠাট্টা করে আমার বাপখুড়োদের সম্বন্ধে বলতেন যে, তাঁরা নিজের জীবনের কথা সবই লিখে গেছেন, আর অন্যের কিছু লেখবার দরকার নেই।

আমার নিজের ধারণা এই যে, সাধারণে ও অসাধারণে যেমন প্রভেদও আছে তেমনি কিছু-না-কিছু যোগসূত্রও আছে, নইলে আমরা তাঁদের মহত্ত্বও বুঝতে পারতুম না। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে, আমরা ক্ষণিকের জন্যে যে উচ্চস্তরে উঠে আবার শীঘ্রই অভ্যস্ত সমভূমিতে নেমে যাই, তাঁরা জীবনের বেশির ভাগ সময়েই সেই উচ্চস্তরে বাস করেন। এই হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রধান তফাত। যেমন ধূপধুনোপত্রপুষ্পশোভিত সংগীতযন্ত্রে ধ্বনিত সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য -পূর্ণ মন্দিরে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ একটি অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করি, কিন্তু সেখান থেকে নিত্যনিয়মিত আবেষ্টনে ফিরে এলেই আবার তেল-নুন-লকড়ির চিন্তার মধ্যেই বেশ আরামে গুছিয়ে বসে যাই। আরাম কথাটি থেকে মনে হল যে, আমরা যে সাধারণ স্তরের আবেষ্টনকে আরাম বলে মনে করি, মহাপুরুষদের পক্ষে তেমনি হয়তো সেই উচ্চস্তরই আরামদায়ক, যেখানে পৌঁছে মহর্ষি বলেছেন—

তিনি আমার প্রাণের আরাম,
মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।

এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে উচ্চতম স্তর, কিন্তু তবু আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারব না যে, রবিকাকার মনের অনেক অন্যান্য স্তরের মধ্যে একটি স্নেহ-মমতা-প্রীতির স্তরও ছিল যার অজস্রধারা আমরা শিশুকালাবধি উপভোগ করেছি। তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গীরাও এর সাক্ষ্য দিতে পারবেন। মনোভাব প্রকাশের অনেক উপায়ই তিনি অবলম্বন করেছেন, যেমন, কবিতা গান চিঠিপত্র ও তাঁর দীর্ঘজীবনের অসংখ্য গদ্যপদ্য-রচনাবলী এবং কর্মধারা। এই সামান্য স্মৃতিরেখায় তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা দুয়েরই বহির্ভূত। তবে আমার নিজস্ব রুচি প্রকাশ করাও হয়তো দোষের হবে না; কারণ, বিপুলা পৃথ্বীর মধ্যে সমমতি সমানধর্মা লোক অবশ্যই মিলবে। শৈশবে-যৌবনে তাঁর কবিপ্রতিভার ছায়ায় মানুষ হয়ে

আমাদের এইটুকু লাভ বা লোকসান হয়েছে যে, তাঁর উত্তরকালের কোনো কবিতাই তেমন বিস্ময় বা আনন্দের উদ্রেক করে না। এমন-কি, যখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিন্ন হয়েছে, সেই বিংশ শতাব্দীর সূচনার পরে রচিত তাঁর বহু কবিতাই আমার কাছে অপরিচিত মনে হয়— সেটি অবশ্য আমারই দুর্ভাগ্য। সুর তাল ভাব যেমন গানের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ, তেমনি ছন্দ এবং মিল যদি কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য হয়, তবে তাঁর কবিতা যে অপূর্ব ছন্দের বৈচিত্র্যে আর অনবদ্য মিলের সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যশালী সে অন্তত আমার বিবেচনায় অন্যত্র অতীব দুর্লভ।

আমাদের পরবর্তীকালে নিজ নিজ অভিজ্ঞতানুসারে নানা জনে রবীন্দ্রনাথের নানা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। যেমন— শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, সীতা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রতিমা দেবী, রানী চন্দ, রানী মহলানবীশ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। তবে, আর যতই সুবিধা থাকুক, বয়সে কেউ আমার সমকক্ষতার দাবি করতে পারবেন না এটুকু আশা করতে পারি।

কেবলমাত্র বই পড়ার পরিচয় আর প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয়ে অনেক তফাত। যদিও আমার প্রাচীন বয়সের দরুন স্মৃতি অনেকটা ঝাপসা হয়ে এসেছে, তাতে তথ্যের কোনো দিকে কমিবেশি যদি বা হয়, সত্য মনের ভিতরে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে— এ দাবি তো করতে পারি।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই যেমন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন রবিকাকার জীবনের একটি বিশিষ্ট পর্বের সূচনা করে তেমনি দ্বিতীয় দশকের পরে বিশ্বভারতী পত্তনেও তাঁর জীবন একটা নতুন মোড় ফেরে, সেখান থেকে ক্রমশ আমাদের যাত্রাপথ ভিন্ন হয়ে যায়। তবু ডালপালা যতই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ুক-না কেন, গাছের মূলকাণ্ড তার আদি প্রতিষ্ঠাভূমিতেই থেকে যায়। এই সূত্রে বাবা বিলেত যাবার সময় যে গানটি লিখেছিলেন তার শেষ কথাটি দিয়ে শেষ করি—

দিবস ফুরায় যত ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়ায় তবু পাদপবন্ধন।

সংগীতস্মৃতি

ছেলেবেলা থেকেই আমরা গানবাজনার আবহাওয়াতে মানুষ— দেশী বিলিতি দু রকমেরই। ঠাকুর-বংশে দেখতে পাই পুরুষানুক্রমে এই দুই ধারাই অল্প-বিস্তর চলে আসছে। যাঁরা বাংলাদেশের সেকালের সংগীত-ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাঁদের এই সূত্রে স্বভাবতই পাথুরেঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মনে পড়বে। তাঁর ছেলে প্রমোদকুমার ঠাকুরের রচিত কতকগুলি বিলিতি স্বরলিপিতে লিখিত ও বিলিতি স্বরসন্ধিযুক্ত (harmony) দেশী রাগ-রাগিণীর ছোটো গৎ আমার কাছে এখনো আছে। শৌরীন্দ্রমোহন বা ছোটো-রাজার গুরুদাস নামে এক নাতিও সেকালের কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কোনো বৈদিক স্তোত্রের স্বরসন্ধি করে গান গাওয়াবার পরীক্ষা করেছিলেন।

আমার বিলিতি সংগীত-প্রীতি অবশ্য লরেটো কন্‌ভেণ্টের শিক্ষাজনিত। সেখানে সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট্ মি. স্লেটারের কাছে পিয়ানো, এবং মান্‌জাটো নামক এক ইতালীয় বেহালা-শিক্ষকের কাছে বেহালা শেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনকার কালে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব্ মিউজিক থেকে গানের ঔপপত্তিক প্রশ্ন এ দেশে পাঠানো হত। তার ইণ্টারমিডিয়েট পর্ব পর্যন্ত আমি পাস করেছিলুম।

রবীন্দ্রস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিলিতি সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যতটা আশ্চর্য মনে হতে পারে বস্তুত তা নয়। কারণ তাঁর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সজ্ঞানে আমাদের ভাইবোনের প্রথম পরিচয় হয় বিলাতপ্রবাসে। সেখানে আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই, পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতি সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর', শুনে ওরা মুগ্ধ হত। সে বয়সে অবশ্য এর সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে,

'Won't you tell me, Molly darling'
'Darling, you are growing old'
'Good-bye, sweetheart good-bye'

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস মূরের

Irish Melodies তখন খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে '*The Last Rose of Summer*' নামে একটি গান আমি ফিরতি-বেলায় জাহাজের কাপ্তেনকে গেয়ে শুনিয়েছিলুম, একটু একটু মনে পড়ে।

রবিকাকা দেশে ফিরে আসার অনতিকাল পরেই কালমৃগয়া গীতিনাটিকা রচনা করেন। তাতে আর বাল্মীকিপ্রতিভাতে কতকগুলি গানের সুরে তাই বিলেতপ্রবাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কতকগুলি গানে ধুয়া বা কোরাসের প্রবর্তনকে বিলিতি গানের পরোক্ষ প্রভাব বলা যেতে পারে। যেমন 'জনগণমন-অধিনায়কে'র "জয় হে জয় হে", 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গনে'র "জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম", 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি'র "তবে কেন তবে কেন" অংশ, 'মম যৌবননিকুঞ্জে'র "সখি জাগো জাগো", আর 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'র "একলা চলো রে"। বাবার 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানে "হোক ভারতের জয়" ইত্যাদি যে ধুয়া আছে, জানি নে, রবিকাকা তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কি না।

পরবর্তী জীবনে আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতি গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনো সেদিনের মূক সাক্ষী-স্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা, '*In the gloaming*', '*Then you'll remember me*', '*Good night, good night beloved*', সুইনবার্নের '*If*' ইত্যাদি। এ ছাড়া বেন্ জনসনের বিখ্যাত গান '*Drink to me only with thine eyes*' ভেঙে লিখেছিলেন 'কতবার ভেবেছিনু'। প্রসঙ্গক্রমে অনেক বছর ডিঙিয়ে এখানে বলছি যে, সম্প্রতি ১৯৫৬ সালে বহুকাল পর বাকে-দম্পতি শান্তিনিকেতনে এলে আমি তাঁদের এই ভাঙা গানের কথা বলি। বাকে সাহেব আমাকে দিয়ে গানটি গাইয়ে তৎক্ষণাৎ টেপ্ রেকর্ডারে তুলে নিলেন। আর একটি গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব 'আভে মারিয়া' রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার যুগল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড়ো ভালো লাগত। ইদানীং কত চেষ্টা করেছি এই বেহালা-সংযুক্ত গানটির স্বরলিপি সংগ্রহ করতে কিন্তু এখনো কৃতকার্য হই নি। তবুও আশা ছাড়ি নি। ওদের সংগতের বিশেষত্ব এই যে, তা আমাদের মতো কেবল মূল সুরকে অনুসরণ করে না, কিন্তু ভিন্ন পথে চলেও সংযোগ রক্ষা করে, তাতে একটি অতিরিক্ত মাধুর্যের সঞ্চার হয়। আমি অবশ্য উক্ত সংগীতরসে বঞ্চিত শ্রোতাদের কথা বলছি নে, কারণ তাঁদের কানে

এটা বেসুরা লাগতে পারে— সে রকম মন্তব্যও আমি শুনেছি। এখানে অবান্তর হলেও বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে যে, আমাদের যন্ত্রসংগীতে এই নিয়ে পরীক্ষা করবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। কোনো একটি গৎ বহু শ্রোতার শ্রুতিগোচর করতে হলে কেবলমাত্র যন্ত্রের সংখ্যা বাড়ানো বৈ অন্য কোনো বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত হয় নি। এখন অবশ্য শুনতে পাই সিনেমা রঙ্গমঞ্চ ও বেতারে যন্ত্রসংগীতে নানাপ্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সব সময় সেগুলি খুব শ্রুতিমধুর ও শাস্ত্রসম্মত হয় কি না সন্দেহ।

আমার অনেক সময় আশ্চর্য বোধ হয় যে, রবিকাকা কখনো কোনো যন্ত্র বাজানোর দিকে মনোযোগ করেন নি। যদিও পিয়ানোয় বসে বসে এক আঙুল দিয়ে ঠুকে গানে সুর বসানোর চেষ্টার কথা মনে পড়ে। তবে তিনি সব-কিছু নতুন ও সুন্দর জিনিসকে সমাদর করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমি অন্য কোথাও লিখেছি যে, তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে অপটু প্রচেষ্টাকেও কোনোদিন নিরুৎসাহ করেন নি। মনে আছে, আমাকে, আমার দাদা সুরেনকে আর সরলাদিদিকে রবিকাকা একবার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির উপর একটি স্বরসন্ধিযুক্ত পিয়ানোর গৎ রচনা করতে বলেছিলেন। কথা ছিল যার সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই উৎসাহ এবং পরিশ্রম করে এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং আমার পুরনো খাতার পাতায় তার সাক্ষী এখনো বর্তমান। তাঁর জীবিতকালে কেউ যদি দেশী সুরে স্বরসন্ধি-সংযোগে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি নিজেই সর্বাগ্রে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন।

রবিকাকা স্বভাবতই ছোটো ছেলে ভালোবাসতেন— আমাদের ভাইবোনকে দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষজীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। ছেলেদের মন ভোলানোর তাঁর একটি উপায় ছিল, নানারকম মজা করে গান গাওয়া। যেমন 'আজু মোরণ বন বোলে' গানটি মধ্যলয়ে আরম্ভ করে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে গেয়ে যখন 'তুম সন হম হলমল কর রমকে রমকে ঝোলে' গাইতেন তখন শেষকালে তাঁর ঠোঁটদুটি যেন কেবল কাঁপত, আর আমরা হেসে কুটিকুটি হতুম। '*Darling*,

you are growing old' প্রভৃতি ইংরিজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন, কিন্তু সে সুর স্বরলিপিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। জ্যাঠামশাই আবার আফ্রিকার প্রদেশ নামগুলিতে সুর বসিয়েছিলেন, যথা—

না র্সা -া র্সা। ধা পা গা মা। পা -ধা -া না। র্সা -া -া -া I
ই জি প্ট্ ন্যু বি আ আ বি সি ০ ০ নি য়া ০ ০ ০

রবিকাকা আবার রেলওয়ে লাইনের অক্ষরেও সুর বসিয়েছিলেন, যথা—

গা। পা পা -া I ক্ষা পা -া। ধা পা -া I গা রা -গা।
E I R ০ G I ০ P R ০ D M ০
রা সা -া I -া -া সা। রা সা -া I ন্া -সা -া। রা -গা -া I
S R ০ ০ ০ S E Ex ০ ten ০ ০ sion ০ ০

তখনকার কালে আমাদের মধ্যে অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে হারমোনিয়ম ও পিয়ানো যন্ত্রের খুব চল ছিল। আগেই বলেছি রবিকাকা কখনো যন্ত্র বাজানোয় মন দেন নি; কিন্তু অবনদাদা এসরাজ বাজাতেন এবং ভাইদের মধ্যে অরুণেন্দ্রনাথ আর আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিন একেবারে নাড়া বেঁধে গয়ার বিখ্যাত এসরাজী ঢেঁড়ীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিকাকামশায়ের পিয়ানো বাজনার সঙ্গে রবিকাকার গান রচনার কথা তো সকলেই জানেন। সেকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে দুই থাকের একটি সুন্দর অর্গ্যান-যন্ত্র ছিল। তার উপরের থাক পিয়ানোর মতো, আর নীচের থাকটা হারমোনিয়মের মতো বাজত। এক সময় আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিমাসেই উপাসনা হত। সেই মাসিক সমাজে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমি হারমোনিয়ম বাজাতাম মনে আছে। 'ভোরের বেলায় কখন এসে', 'ভবকোলাহল ছাড়িয়ে', 'তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে', 'দাও হে হৃদয় ভরে দাও' প্রভৃতি গানগুলি কত ভালো লাগত।

তখনকার দিনে রবিকাকার জনপ্রিয় গানগুলির পরিচয় তাঁর ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' দেখলেই পাওয়া যাবে। রবিকাকা দু-একটি হিন্দী গানও শখ করে গাইতেন— যেমন, 'ক্যায়সে কাটোঙ্গি রয়ন সো পিয়া বিনে' (বেহাগ), 'জিন ছুঁয়ো মোরে বঁইয়া নগরওয়া' (রামকেলি)— এই গানটি থেকেই 'আঁখিজল মুছাইলে, জননী' ভাঙা, এবং 'মনূকী কমলদল খোলিয়ঁা' (বাহার) ভেঙে 'এই-যে হেরি গো দেবী' রচিত। আর-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল— 'লাইরি মোরি শ্যাম ইদোরিয়া' গানটির সুর পূরবী এবং

এর কিছু আভাস নিয়ে বহুদিন পরে 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটির সুর দেন। তাঁর একটি খাতায় 'সমুখে শান্তিপারাবারে'র কথা আর সেই পাতার কোণে 'লাইরি' শব্দটি লেখা দেখে তাঁর সংগীত-গবেষকরা এই ইঙ্গিতের মর্ম বুঝতে পারেন নি। আমাকে সেই কথা বলায় আমি তাঁদের এই সমস্যার সমাধান করে দিলুম। কতকগুলি নিধুবাবুর টপ্পাও গাইতেন, 'যে যাতনা যতনে'— এর সঙ্গে 'থাম্ থাম্ কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ' গানটির সুরের মিল লক্ষণীয়। আর দুটি গানও গাইতেন, রাম বসুর ''মনে রইল সই মনের বেদনা'' ও শ্রীধর কথকের 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে'।

অনেকে তাঁর প্রথমবয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী ব'লে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন, 'আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইস্‌থেটিক্'। এর সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় মায়ার খেলার দুটি-একটি গানের সেকালের ও একালের রূপের তুলনা করলে। যেমন সেকালের— 'আমি কারেও বুঝি নে শুধু বুঝেছি তোমারে'— বেহাগ (এর সঙ্গে অক্ষয় চৌধুরীর 'কেনই বা ভুলিব তোমায়' গানটির কিছু মিল আছে)। গানটির একালের পরিবর্তিত রূপ 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'। এইখানে বলে রাখি, কারোয়ারে আমাদের সঙ্গে থাকাকালীন কতকগুলি কানাড়ী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছিলেন। রবিকাকা প্রয়োজনানুসারে নানা পুরনো গানের সুরে অন্য কথা বসিয়ে অদলবদল করে নিয়েছেন। যথা, চিত্রাঙ্গদার 'ক্ষমা করো আমায়' গানটির সুর নেওয়া হয়েছে 'জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ' নামক অতি পুরনো ব্রহ্মসংগীত থেকে। বাল্মীকিপ্রতিভার 'অহো! আস্পর্ধা একি তোদের' গানটির সুর 'চরাচর সকলি মিছে মায়া' গান থেকে নেওয়া। শ্যামার 'হায়, এ কী সমাপন' গানটির সুর বাল্মীকিপ্রতিভার 'হা, কী দশা হল আমার' থেকে নেওয়া। এই সুরটির মূল আবার কর্তাদাদামশায়ের মুখে শোনা একটি ফার্সী গান— 'হালমে রবে রবা'। বাল্মীকিপ্রতিভার 'আয় মা আমার সাথে' গানের সুর বিবাহোৎসব নাটিকায় তাঁর পুরনো গান 'মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন' গানটির অনুরূপ। কালমৃগয়ার 'কে জানে কোথা সে' তাঁর আর-একটি পুরনো গান 'সহে না যাতনা'র সুরে বসানো। শ্যামার আর-একটি গান 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা'র সুর পুরনো ব্রহ্মসংগীতের 'জাগিতে হবে রে' (শঙ্করা) থেকে নেওয়া। 'কী হল তোমার বুঝি বা

সখী' তাঁর একটি পুরনো গানে 'কী হল আমার বুঝি বা সখী'র কেবল 'আমার'টুকু পরিবর্তন করে 'তোমার' বসানো হয়েছে। বাল্মীকিপ্রতিভার 'জীবনের কিছু হল না' গানের মূল ওঁরই একটি পুরনো গান 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'। বাল্মীকিপ্রতিভার 'মরি ও কাহার বাছা', মায়ার খেলার 'আহা আজি এ বসন্তে' এবং কালমৃগয়ার 'মানা না মানিলি'র সুর *'Go where glory'* নামে একই আইরিশ মেলডি থেকে ভাঙা।

তেলেনা গানের অর্থহীন শব্দগুলি নিয়ে, যথা, 'ওদের্‌তানা দিতাহুম্ তানুম্ দেরে না' কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ ক'রে রবিকাকা গাইতেন মনে পড়ে— উপরোক্ত শব্দগুলি একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে গেয়ে বীররস, আবার টেনে টেনে কোমলভাবে গেয়ে করুণরস প্রকাশ করতেন।

আমাদের সংগীতশাস্ত্রে বাহার রাগিণীটিকে বসন্তকালের নববিকাশ প্রকাশের উপযোগী বলে মনে করা হয়। কিন্তু রবিকাকা এই বাহার রাগিণীকে অনেক গানে মনের আবেগ প্রকাশের বাহনরূপে নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন, 'গেল গেল নিয়ে গেল' 'রাখ্, রাখ্, ফেল্ ধনু' প্রভৃতি। সিন্ধুর মতো করুণ কোমল রাগকেও কেমন উদ্দীপনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন সেটা 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানে লক্ষণীয়। অবশ্য লয় ও গায়কী দ্বারা গায়কেরও সে ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয়, এ-সকল ক্ষেত্রে নাট্যরস-নামক একটি নবতর রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা নানারকমে পূরণ করেছেন, তাঁর সংগীত-ভক্তগণ চেষ্টা করলে আরো এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন।

বাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মহলে এক সময় মায়ার খেলার গানের খুব আদর হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতে না পারলেও তারা 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' গানে 'টোবে কেন, টোবে কেন' বলে ধুয়োর অংশে যোগ দিত। এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, কতকগুলি সুর সর্বজনীন অর্থাৎ কোনো বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ নয়। আমি যখন বলি আমাদের দেশের সংগীতও স্বরসন্ধির ব্যবহারে একেবারে অযোগ্য নয়, বরং এতে তার ঐশ্বর্য বাড়বার সম্ভাবনা— যা নিয়ে অনেক সময় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে মতভেদ হয়— তখন এই ধরনের সর্বজনীন সুরের কথাই আমার মাথায় থাকে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কয়েকটি গান রচিত হয়েছে। যেমন, বঙ্গভঙ্গ-

আন্দোলন উপলক্ষে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং আরো অনেক গান; সার্‌ তারকনাথ পালিতের বাড়ি নিমন্ত্রণে, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন যাঁরা, তাঁদের প্রতি ভর্ৎসনা হিসেবে 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'। কয়েকটি বিয়ের গানের ইতিহাসও এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা— 'সুখে থাকো আর সুখী করো' গানটি শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের বিবাহোপলক্ষে এবং 'নবজীবনের যাত্রাপথে' 'দুজনের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি' ও 'সুমঙ্গলী বধূ' গান-ক'টি শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর বিবাহোপলক্ষে রচিত। 'ওহে নবীন অতিথি' গানটি কোনো বন্ধুকন্যার অন্নপ্রাশনের জন্য রচিত। একবার, মনে আছে, আদি নববিধান সাধারণ— এই তিন সমাজের মিলিত উৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ধর্মসভা হয়। সেই সভার জন্য রবিকাকা 'পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান' গানটি রচনা করেন।

ছেলেবেলার গানের স্মৃতির সঙ্গে গানের সাথীও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমার দিশি বিলিতি সংগীতের সর্বদা সঙ্গের সাথী ছিলেন সরলাদিদি। আমরা যা-কিছু শিখেছি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে শিখেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে অনেক সুন্দর সুর সংগ্রহ করেছেন, নিজেও বহু সংগীত রচনা করেছেন। আমার সেজোকাকা হেমেন্দ্রনাথও খুব নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর ঘরে দিশি বিলিতি সংগীতের যুগল স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছিল। তাঁর বড়োমেয়ে প্রতিভা-দিদিকে তিনি সর্ববিদ্যাপারদর্শিনী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা মনীষা 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রে এবং রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা, 'পাদ-প্রান্তে রাখ' সেবকে' প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত বসিয়েছিলেন। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নি। তাঁর সেজোমেয়ে অভিজ্ঞা রবিকাকার প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সুন্দর গলা ও অভিনয়ের ক্ষমতার কথা তাঁর রচনায় উল্লিখিত আছে। সেজোকাকার পরিবারের ছেলেরাও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাতবৌ অমিয়াদেবী সুকণ্ঠ ও শিক্ষাগুণে রবীন্দ্রসংগীতে নাম করেছেন। সেজোকাকার নাতনী শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত বংশের ধারা রক্ষা করে চলেছেন।

জ্যাঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরে সেরকম ভাবে ওস্তাদ রেখে গান শেখাবার পদ্ধতি না থাকলেও, হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু-একখানা গান না করতে পারে এমন ছেলে তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিল না বললেই হয়। তাঁর মেজোছেলে

অরুদাদার রীতিমত এসরাজ শেখবার কথা আগেই বলেছি। তাঁর বড়োমেয়ে সরোজদিদির যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মিষ্টি গলা ছিল। ছোটোমেয়ে উষাও দলের সঙ্গে গাইতেন। নাতিদের মধ্যে সৌম্যেন্দ্রনাথ এখনো বংশের ধারা বহন করে চলেছেন। তবে দিনেন্দ্রনাথই একাধারে যেমন তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ নাতি, যাঁর খ্যাতি শান্তিনিকেতন-পর্ব পর্যন্ত চলে এসেছে। দিনু তিন বছর বয়স থেকেই যে-সব গান গেয়ে বেড়াত ছোটোমুখে বড়োকথা হিসেবে তা শুনে আমাদের হাসি পেত, যেমন, 'নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন'। আর, কিছুদিন পরে নাকি জ্যাঠামশায় পাশের ঘর থেকে শুনেছেন, দিনু গাইছে— গানটি জ্যাঠামশায়েরই রচিত— 'শয়ন ভিজিল নয়নজলে, ওলো সজনি'; অমনি তাকে ডেকেছেন, 'দিনু, এদিকে এসো'। দিনু এসে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। 'এ গান তুমি কার কাছে শিখলে?' দিনু নতমস্তকে নিরুত্তর। 'খবরদার, এ গান আর গাবে না'। যবনিকা পতন।

আমি রবিকাকার কাছে আলাদা ক'রে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল বাড়িময় হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়িতে পিয়ানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দু-একটা গান শেখাতে চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, 'কে গো অন্তরতর সে' প্রভৃতি। আর, আমার গান শিখতে দেরি হয় বলে মন্তব্য করায় আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। দিনু এবং খুকু (অমিতা সেন) যেরকম তাড়াতাড়ি গান শিখত শুনেছি তার তুলনায় আমাদের যে ঢিমে তেতালা মনে হবে তার আর আশ্চর্য কি। খুকুর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয় নি, তবে কলকাতায় কোনো সূত্রে তার গান শোনবার সুযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষদ্ নামক একটি সভা উপলক্ষে আমি আহূত হয়ে সেখানে একটি ছোটো প্রবন্ধ পড়ি। রবিকাকাও নিমন্ত্রিত হয়ে খুকুকে সঙ্গে করে আসেন এবং খুকু তাঁর পাশে বসে শুধু-গলায় 'আমার মল্লিকাবনে' গানটি সুন্দর গায়। তার অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে দুদিনের জন্য এসে উত্তরায়ণের সামনে টেনিসকোর্টে বসে দেখেছি খুকু চার-পাঁচ বার ক্রমাগত শ্যামলীতে রবিকাকার কাছে যাতায়াত করছে। পরে শুনেছি যে, সেই সময় রবিকাকা তাঁর বড়ো বড়ো কবিতায় সুর দেওয়ার নতুন রীতি প্রবর্তন করছিলেন, সেই গান শেখবার জন্যই এত ছুটাছুটি।

যতদূর জানি সংস্কৃত স্তোত্রে সুর রবিকাকাই প্রথম দিতে আরম্ভ করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত একরকম নিয়মই হয়ে গেছে যে, মাঘোৎসব আরম্ভ হবে একটি বেদগান দিয়ে। তার পরে তাঁর পরিবারের দু-একজন তাঁকে অনুসরণ করে সংস্কৃত স্তোত্রে সুর বসিয়েছেন। যথা, বিখ্যাত 'ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণ' স্তোত্রটিকে প্রতিভাদিদি কেদারা রাগিণীতে সুর বসান। 'সংগচ্ছধ্বম্' স্তোত্রের সুর 'আনন্দলোকে'র সুরেরই রূপান্তর; এই সুরটি সরলাদিদি মহীশূর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন পরে বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি সেটি মহীশূরের জাতীয় সংগীতের সুর। সংস্কৃত স্তোত্রের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণের রীতি রক্ষার প্রতি রবিকাকা খুবই সতর্ক ছিলেন। প্রতিভাদিদির সুর দেওয়া গীতাস্তোত্রটি মাঘোৎসবে গাওয়া হবে বলে জোড়াসাঁকোর উঠানে মহড়া চলছে। রবিকাকা অসুস্থ হয়ে তেতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনছিলেন। মনে আছে, তিনি আমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়ে এক জায়গায় সুরটা ঠিক করে দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে বলে দিলেন।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংগীতচর্চার কথা বাদ দিলে বাইরের বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে অক্ষয় চৌধুরী এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথা। শেষোক্তের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। পরে অবশ্য তাঁর ছেলেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। লোকে বলে যে, তাঁর রচনার প্রভাব রবিকাকার কবিতায় লক্ষিত হয়, বিশেষত বাল্মীকিপ্রতিভায় সরস্বতী-বন্দনাদিতে। সম্ভবত রবিকাকার কাছেই তাঁর কতকগুলো গান শুনে শুনে শিখেছিলুম, যা আমার গানের খাতায় লেখা আছে। সপরিবার অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর রচিত কতকগুলি গান সশরীরে রবিকাকার গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে, যেমন, 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে' ও 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা'। যেমন বিহারী চক্রবর্তীর 'নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার' তেমনি অক্ষয় চৌধুরীরও একটি প্রেমের গান 'কেন গো ভুলিব তোমায়' সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

গায়ক বন্ধুদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর অতুলপ্রসাদ সেন স্বনামধন্য। তাঁদের কাছে তাঁদের নিজের গান শেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এইখানে কৃষ্ণনগরের একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলে নিই। অনেকেই শুনেছেন যে, রবিকাকা এবং সত্যদাদা যখন দ্বিতীয় বার বিলেত যাত্রা করেন তখন মাঝপথে মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন। এ যাত্রা এক হিসেবে নিষ্ফল হলেও আর-এক

দিক থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষে সুফলপ্রদ হয়েছিল। কারণ এই জাহাজেই শুনেছি আমার বড়োভাশুর আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবিকাকার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন থেকেই রবিকাকা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কুটুম্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হবার কল্পনা মনে পোষণ করেন। পরে প্রতিভাদিদির সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রবিকাকা কৃষ্ণনগরে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। কৃষ্ণনগরে তখন রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে একটি উচ্চাঙ্গ গানের আসর ছিল, আমার স্বামীও তাতে যোগ দিতেন। পরে তাঁর কাছেই শুনেছি যে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি 'বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই' গানটি গেয়েছিলেন। এবং সেই-সব উচ্চাঙ্গ-সংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছ থেকে নাকি অনেক বাক্যবাণ তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল, যেমন, 'হ্যাঁ, বাঁশরি অনেকে বাজাতে চায়, কিন্তু বাঁশরি বাজাতে চাইলেই কি বাঁশরি বাজে। বাঁশরি বাজাতে হলে শিক্ষা চাই' ইত্যাদি। কারণ সে সরল সুরের ভিতর তাঁদের অভ্যস্ত তানকর্তব তাঁরা খুঁজে পান নি।

বাইরের মেয়েদের ভিতর গায়িকা হিসেবে অমলা দাশকে আগে মনে পড়ে। এখনো গ্রামোফোনে তাঁর সুন্দর চড়া গলায় 'একি আকুলতা ভুবনে' এবং 'চির-সখা হে' শুনে লোকে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই পায়। তাঁর গাওয়া একটি হিন্দী গান 'সৈঁয়া ঝাঁউ ঝাঁউ' ভেঙে 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' গানটি রচিত। বঙ্কিম-বাবুর মৃণালিনীর 'যমুনারি জলে মোরে' এবং 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী' গান দুটি তিনি খুব গাইতেন। কলকাতার কোনো এক কংগ্রেসে অমলা দশ হাজার লোকের সভায় একলা 'বন্দেমাতরম্' গানটি বিনা মাইকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর গলা যেমন মিষ্টি তেমনি সতেজ ছিল। এদিকে গৃহস্থালীতেও তিনি সুপটু ছিলেন। নাটোরের মহারাজার সংসারে যখন মহারানীর সহচরী হিসেবে ছিলেন, তখন রাজবাড়ির নেমন্তন্নে তাঁর রান্না খেয়ে কত তৃপ্তি লাভ করেছি।

ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার, সার কে. জি. গুপ্তের পরিবার, ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরিবার ইত্যাদি। এঁদের সকলেরই ঘরে সুগায়িকা ছিলেন যাঁরা রবিকাকার কাছেই তাঁর গান শেখবার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন ডাক্তার নীলরতনের বড়োকন্যা নলিনী ও তাঁর অপর এক কন্যা অরুন্ধতী, সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা, কনক দাস, সাহানা বসু। ডাক্তার নীলরতন সরকারের মেয়েরা

এখনো পর্যন্ত দেশী-বিলিতি সংগীতের একসঙ্গে চর্চা রেখেছেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির পিছনের বাগানে প্রথম যে বর্ষামঙ্গল হয় তাতে বড়োঝুনু সাহানা বসু ও ছোটোঝুনু চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের দুটি গান 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে' আর 'ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে' কী অপূর্ব সুন্দর লেগেছিল— যেন মধুঢালা।

এ পর্যন্ত রবিকাকার শান্তিনিকেতন-বাসের পূর্বেকার সংগীতস্মৃতির কথা বলেছি। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গার সঙ্গে রবিকাকার তখনকার কালের গানরচনার স্মৃতি জড়িত আছে। একবার দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একঝাঁক গান নিয়ে এলেন, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' ইত্যাদি; আবার শিলাইদহের বোটে বসে হয়তো আর-এক ঝাঁক রচনা করেছেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পর যে গান রচনা আরম্ভ করলেন সে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে নয়, যেন ধারাবাহিক স্রোতের মতো বইতে লাগল। সে স্রোত প্রায় জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে চলেছে।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের পরেও রবিকাকা কয়েক বছর কলকাতায় ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। তাই সেখানকার রবীন্দ্রভক্তরা তাঁর নব নব সংগীত ও সাহিত্যরস উপভোগে বঞ্চিত হত না। এই মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে প্রতিভাদিদির স্থাপিত 'সংগীতসংঘে' রবিকাকা তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। উদাহরণগুলি নিজেই গেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের বাড়িতে 'বিচিত্রা' আসরের কথাও অনেকের জানা আছে। তাতে তিনি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার দিয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী পুত্রবধু প্রতিমাকে একটি জরির ফিতে দিয়েছিলেন— আসরের বন্ধুদের যাতে সৌজন্য আর প্রীতির ডোরে বেঁধে রাখতে পারেন, তারই প্রতীকস্বরূপ। এক আসরে একবার মনে আছে সৌম্যেন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী রবিকাকার 'হৃদয় আমার নাচে রে' আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত একটি নাচ দেখিয়েছিলেন। আর-একবার রবিকাকা বিলেতে বাজনার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির পদ্ধতি শুনে এসেছিলেন, সে পরীক্ষা এখানেও করেন। আজকাল সেতারের গতের সঙ্গে গান করবার যে ধারা প্রচলিত হয়েছে তারও বোধ হয় প্রথম নমুনা আমরা বিচিত্রার আসরে শুনিয়েছিলুম 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে' গানটির সঙ্গে একটি ভূপালীর গৎ জুড়ে।

নাট্যস্মৃতি

আমার নাট্যস্মৃতি অনেকাংশে সংগীতস্মৃতির সঙ্গে জড়িত, কারণ রবিকাকা প্রথমজীবনে গীতিনাট্যই রচনা করেছিলেন। আমাদের কালের ব্যক্তিগত স্মৃতি আরম্ভ হয় স্বভাবতই বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর থেকে। মা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ঘরোয়া অভিনয় করাতে খুব ভালোবাসতেন। সেজন্য অনেকসময় তাঁর কত মান-অভিমান ভাঙাতে হত, সে গল্পও তাঁর কাছে শুনেছি।

মানময়ী

তাঁরই প্ররোচনায় সম্ভবত মানময়ী নাটক (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা জ্যোতিকাকা স্বর্ণপিসিমা অনেকসময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।

মানময়ীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আমার কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। দেবদেবীর মানভঞ্জন নিয়েই কারবার— তা নামেই প্রকাশ। মানময়ীর অভিনয়ে দেবতাদের মধ্যে রবিকাকা আর জ্যোতিকাকামশায় ছিলেন মনে আছে।

সব-প্রথমেই ছিল রতি ও বসন্তের গান—

রতি। ছিলে কোথা বল, কত কি যে হল
জান না কি তা ?
হায়, হায়, আহা !
মান দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ।
এখানে কি কর,
তুমি ফুলশর,
তারে গিয়ে কর ত্রাণ।
বসন্ত। চল চল, চল চল, চল চল, ফুলধনু,
চল যাই কাজ সাধিতে।...

আর-এক জাতের গান মানময়ীতে ছিল যা আমাদের ঐ বয়সে গাওয়া অকালপক্কতা বলে নিশ্চয় সকলে মনে করবেন—

উর্বশী। সজনী লো বল, কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না ?...
এনে দে এনে দে তারে, আর যে লো পারি না।

কিন্তু আমরা সমবয়সী দল নিঃসংকোচে এ গান বাড়িময় গেয়ে বেড়াতুম।

বসন্ত-উৎসব

স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসবে'র (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান 'ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনীফুল' এখনো কানে বাজে।

অন্য গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।...

ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তাঁর বড়ো বড়ো চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। জ্যোতিকাকা আর রবিকাকা দুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন—

কিরণ। লও এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল।
কিরণ। মূঢ় হ রে সাবধান !
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরান।

এই নাটকটি পরে সখিসমিতির পক্ষ থেকে কোনো বাগানবাড়িতে অভিনীত হয়। যদিও সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে স্টেজ বাঁধা সম্ভব ছিল না। এই নাটকে সুরেন আর জ্যোৎস্নাদাদা আমাদের প্রধান সহকারী ছিলেন। স্টেজের পশ্চাৎপটকে বনের উপযোগী করে সাজাতে গিয়ে তাঁরা দুই ধনুর্ধরে মিলে বাঁশের জাফ্রির উপর শুকনো মস্ গুঁজে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ডিমের খোলাতে সলতে জ্বেলে জোনাকির ভাব আনতে চেয়েছিলেন। আগুন ও ঘাসের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাঁদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে বুঝতে পারেন নি, তা শীঘ্রই প্রকাশ পেল। পশ্চাৎপটের মাঝে মাঝে আগুন ধরে

গেল। চারি দিকে হৈহল্লা পড়ে গেল। আমরা মেয়েরা ছুটাছুটি করে নাবার ঘরের টব থেকে জল আনতে লাগলুম, আর সুরেন ও জ্যোৎস্নাদা অগত্যা কামিজের আস্তিন গুটিয়ে পর্দা ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য হলেন। সে এক হাস্যকর ব্যাপার, যদিও আর-একটু বেশিদুর গড়ালে কান্নাকাটি পড়ে যেতে পারত।

এই সময়কার একটি হাসির গানও মনে পড়ে—

ছিলি যেখানে সেখানে যা রে ভৃঙ্গ !
চটক-ফটক দেখালে কি হবে
আস্‌কারা মাস্‌কারা পেয়ে করিস নে কো রঙ্গ।
করিস নে করিস নে মিছে হ্যাকেরা
রাগে গর গর গর গর গর গর জ্বলিছে অঙ্গ।

বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে

মানময়ীর আগে কি পরে ঠিক মনে নেই, রবিকাকা ও জ্যোতিকাকা দুই ভাইয়ে মিলে অভিজাত বন্ধুবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য বিবাহঘটিত একটি ক্ষুদ্র গীতি-নাটিকা অভিনয় করেছিলেন। তাতে তাঁরা দুজনে বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করে গান করেছিলেন। রবিকাকা বিবাহের সপক্ষে গাইতেন—

একা একা এতদিন কেটে গেল এখন দুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব'
দুজনে এক হব
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল।
তাহারি মুখ চেয়ে
যামিনী যাবে বয়ে
নিবাব তারি প্রেমে হৃদি-অনল॥

তার পর বিপক্ষে জ্যোতিকাকা গাইতেন—

ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর— সেই সে কাঁদুনি কি কব সখা।
কথায় কথায় অভিমান তারি, সাধ্য কি যে সে মন রাখা।
গৃহে থেকে সাধ করে— অরণ্যে যে হবে থাকা॥

তার পর আবার সপক্ষের গান—

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ
তাহা বুঝিলে না তুমি মনে রয়ে গেল দুখ।
অভিমান আঁখিজল নয়ন ছল ছল
মুছাতে লাগে ভালো কত
তাহা বুঝিলে না তুমি মনে রয়ে গেল দুখ॥

এই গানটি গীতবিতানে স্থান পেয়েছে।

এই অভিনয়ের সঙ্গে সামান্য একটি মজার স্মৃতি জড়িত আছে। পাইকপাড়ার কান্তিচন্দ্র সিংহ, সুরেন সুন্দর ছেলে ছিলেন বলে তাঁকে আদর করে কোলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বসে ছিলেন। তিনি এই নাটক দেখে এত হাসলেন যে, সুরেন গড়িয়ে তাঁর চৌকির নীচে পড়ে গেলেন।

হেঁয়ালি নাট্য

এর পরে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত রবিকাকার হেঁয়ালি নাট্যের সঙ্গে। বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যেই বোধ হয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বর্ণপিসিমারা জোড়াসাঁকো ছেড়ে এক-সময়ে কাশিয়াবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়িতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে আমাদের সকলের খুব যাওয়া-আসা ছিল; রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। এই সূত্রে তাঁর 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' (সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ ১২৯২ মাঘ : ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ) নাটকটি নিজেরাই অভিনয় করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দেন। আর-একটি কথা মনে পড়ে— অঙ্কুরেই যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সরলাদি আর হিরণদিদিও এইখানেই পাড়ার মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভা

বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) ও কালমৃগয়ার (প্রথম প্রকাশ ১৮৮২) নাট্যস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যে, এই দুটি নাটকেই আমরা যোগ দিয়েছিলুম। বাল্মীকিপ্রতিভায় আমি একবার লক্ষ্মী সেজেছিলুম, রবি-কাকা বাল্মীকি। তবে ১৮৮১ সালে প্রথম বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয়ে নয়,

সেবারে প্রতিভাদিদি সরস্বতী আর বোধ হয় সুশীলাদিদি লক্ষ্মী সেজেছিলেন। জ্যাঠামশায়ের একটু অভ্যাস ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'এই যে অমুক সাহেব' বলে স্নেহভাজনদের পিঠ থাব্‌ড়ে দেওয়া। প্রথম বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়ের পরে প্রতিভাদিদি সরস্বতী সেজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁর পিঠ থাব্‌ড়ে 'এই যে সরস্বতী সাহেব' বললেন! আমি সেখানে তখন উপস্থিত।

অভিনয়ক্ষমতা যে আমার খুব ছিল না, তার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘরোয়া সাক্ষীর কথা উল্লেখ করব। লক্ষ্মীর ভূমিকায় আমার একমাত্র গান 'কেন গো আপন মনে'র 'আমারে শুভক্ষণে হের গো চোখে' অংশটি গাইবার সময় যখন বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখাতুম, তখন অভি হেসে বলত, 'বোনদিদি, অমন কোরো না। মনে হয় যেন পেট কামড়াচ্চে!' এই বোনদিদি সম্বোধনের ইতিহাসটুকু হচ্ছে, অভি আমার চেয়ে মোটে পনেরো দিনের ছোটো ছিল। অভি একাসনে বসে সমস্ত বাল্মীকিপ্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি প্রথম থেকে অভিনয় করে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারত।

এই এক বাল্মীকিপ্রতিভা যে কত বার কত সূত্রে অভিনীত হয়েছে এবং আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে কত ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাট-পত্নী লেডি ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখলে ক্ষতি নেই যে, ইংরেজ জাতির গুণ ও তাদের সামাজিক প্রথার প্রতি বাবার স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। কলকাতায় আসবার পর লাট-পত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য বাল্মীকিপ্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডি ল্যান্সডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটোলাট-পত্নী লেডি এলিয়ট প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিপুদাদা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ রসিকতা করে বলেছিলেন, 'জোড়াসাঁকোর উঠানের সাজসজ্জা দেখে লাট-পত্নী বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই লাটসাহেবকে বলবেন— Darling! All velvet and festoons!'

অক্ষয় চৌধুরী যেমন পারিবারিক বন্ধু বলে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তেমনি অক্ষয় মজুমদার বলে আর-একজন ছিলেন,

'বাল্মীকিপ্রতিভা'-অভিনয়ে

ক্ষিতীন্দ্র সুরেন্দ্র অরুণেন্দ্র বলেন্দ্র সত্যপ্রকাশ হিতেন্দ্র গগনেন্দ্র ঋতেন্দ্র অবনীন্দ্র রবীন্দ্র

বাল্মীকিপ্রতিভা-অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী
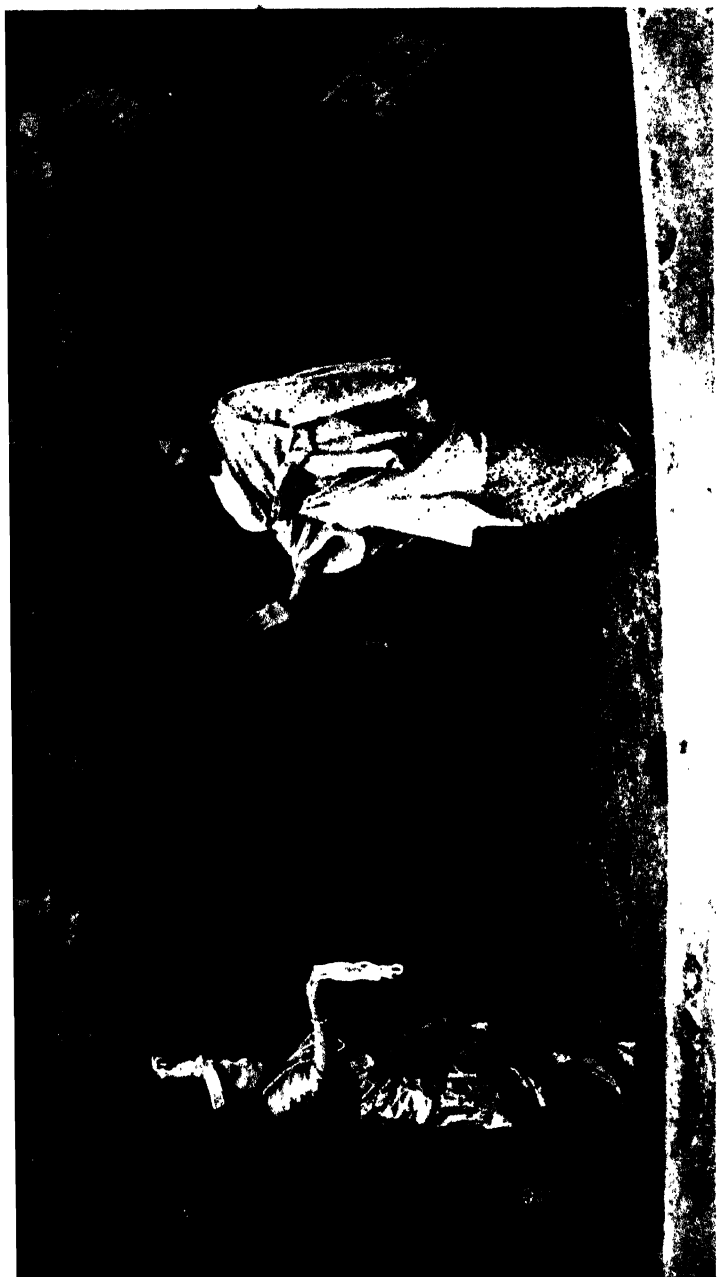
যিনি অভিনয় ও সংগীত দুয়েতেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দুজনের একই নাম বলে আমরা তাঁদের যথাক্রমে ছোটো-অক্ষয়বাবু আর বড়ো-অক্ষয়বাবু বলে উল্লেখ করতুম। বড়ো অক্ষয়বাবুর খুব দরাজ গলা ছিল, যেটি মাঘোৎসবের উঠোনে ধ্রুপদ গাইবার সময় বিশেষ কাজে লাগত। তাঁর আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তাঁর যে চড়া স্বর গলায় কুলোত না সেটি ঊর্ধ্বে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন। তাঁর এক রোগ ছিল লেখকের রচনার উপর নিজের কথার রঙ চড়ানো। তাতে আরো রসিকতা বাড়বে বলে মনে করতেন। রাজা ও রানীতে সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার সংবাদে যখন বিক্রম অত্যন্ত বিচলিত, সেই সময়ে ত্রিবেদীর (বড়ো-অক্ষয়বাবু) সঙ্গে পথে দেখা হল। রানীকে ত্রিবেদী যেতে দেখেছেন শুনে বিক্রম যখন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চোখে অশ্রু ছিল ?' সেই নাট্যরসের গাম্ভীর্য নষ্ট করে তিনি নাক ফুলিয়ে বললেন, 'ওচ্ছ্ ফোচ্ছ্ দেখি নাই চোখে'— মূল নাটকে শুধু আছে 'অশ্রু দেখি নাই চোখে'। আর একবার বাবা যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাজা ও রানীর অভিনয়ের পরিচালনা করছেন, তখন বড়ো-অক্ষয়বাবু কোনো-এক ভূমিকায় তাঁর বক্তব্যের অতিরিক্ত 'সন্দেশ মন্দেশ রসগোল্লা ফসগোল্লা' জুড়ে দেওয়াতে বাবা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে অক্ষয়বাবুর এমন অভিমান হল যে, তিনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়ে কথাগুলি কিছুমাত্র রসকষ না দিয়ে একেবারে শুকনো ভাবে বলে গেলেন। তখন বাবাকে মা বলতে লাগলেন, 'তুমি কেন ওঁকে এমন করে বললে, এখন দেখ কি করে অভিনয় চলবে।' তখন আবার তাঁর মানভঞ্জন করবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশটি টাকা এবং একটি শাল ঘুষ দিয়ে তবে বাগ মানানো গেল। বড়ো-অক্ষয়বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সুযোগ পেলে তিনি শুধু কমেডি নয় ট্রাজেডিও ভালো অভিনয় করতে পারেন। বিচিত্র মানুষের আত্মপ্রত্যয় !

এ-হেন অক্ষয়বাবু বাল্মীকিপ্রতিভার পূর্বোক্ত বিশেষ অভিনয়ে লাট-পত্নীর সামনে প্রথমদস্যু সেজে খুব ফুর্তির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা ভাষা না বুঝতে পারলেও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা বিষয়টা সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অক্ষয়বাবু প্রথম বারের পর দ্বিতীয়বার যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন লেডি এলিয়ট নাকি বলেছিলেন, 'He is my man'। ছোটোলাট-পত্নী তাঁকে my man বলেছেন এই গৌরবের কথা অক্ষয়বাবু চিরদিন সকলের কাছে গল্প করে

বেড়িয়েছেন। অবনদাদার 'ঘরোয়া'তে আমাদের বাড়ির নাটক-অভিনয়ের সুন্দর বর্ণনা আছে।

কালমৃগয়া

কালমৃগয়ার অভিনয়ও প্রায় সমসাময়িক এবং এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। আমি একবার এই নাটকটি করাতে গিয়ে একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। দিনু সেজেছিলেন অন্ধমুনি এবং তাঁর ভাগ্নে ও ভাগ্নী সঞ্জীব আর সুরমা সেজেছিল ঋষিকুমার ও লীলা। দিনু বললে, 'ঋষিকুমারবধের পরে যে সঞ্জীবকে খাটিয়ায় করে নিয়ে আসবে সে আমি দেখতে পারব না।' আবার ঋষিকুমারের ফিরতে দেরি দেখে তার বোন সুরমা 'বলো বলো পিতা কোথা সে গিয়েছে' গাইতে গাইতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিল। এ-সব দেখেশুনে আমি বললুম, 'থাক্, কালমৃগয়ার আর অভিনয় করে কাজ নেই।'

এমন কর্ম আর করব না

কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের এমন কর্ম আর করব না (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় অলীকবাবু। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুবশত এর যে অভিনয়টি আমাদের সব চেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এরকম ছিল—

সত্যসিন্ধু	জ্যাঠামশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ
অলীকবাবু	রবিকাকা
গদাধর	সেজোপিসেমশায়
জগদীশ	জগদীশদাদা
হেমাঙ্গিনী	শরৎকুমারী চৌধুরানী
পিসনি	বর্ণপিসিমা

কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণপিসিমা! এখনো মনে পড়ে, প্রথম দৃশ্যে তিনি দাসীদের মতো মাটিতে বসে হাঁটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরজা ঠেলতেই মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'দরজা ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধরবাবু যে! বড়োমানুষের

মোসাহেব, দশটা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল?' তার পরের দৃশ্যে অলীকবাবু ও সত্যসিন্ধু স্টেজে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাখ্যাদেশের রাজকন্যা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।' সেই ভাব ও কথা এখনো যেন কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেজে অরুদাদার গান, তারই বা কী কায়দা? আর জ্যোতিকাকার সেই চীনেম্যান সেজে চানেভাষায় কিচিরমিচির কথা— কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাঙ্গিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো জিনিস।

বিবাহ-উৎসব

বিবাহ-উৎসব নামে আর-একটি ঘরোয়া গীতিনাটক আমাদের সময়ে চলিত ছিল। নামেই তার বিষয়বস্তুর প্রকাশ। আমার পিসতুতো বোন সুপ্রভাদিদির বিবাহের সময়ে, মনে পড়ে, পুজোর দালান থেকে বরকনে দোতলায় বাসরে পৌঁছবার আগেই কনের হল ফিট্। তখন বাড়িতে কি জানি কেন হিস্টিরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আমি আর ঊষাদিদি কোনোরকম করে সেই মূর্ছিত কনেকে দুদিক থেকে ধরে অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বাসরঘরে এনে ফেললুম। সেখানে তিনি মছলন্দে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে রইলেন, পাশে বর সুকুমার হালদার হতভম্ব হয়ে বসে কী মনে করছিলেন তা তিনিই জানেন। এই অবস্থায় আমাদের সেই 'বিবাহ-উৎসব' অভিনীত হয়। দিনুর মা সুশীলা-বউঠান নায়ক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান 'ও কেন চুরি করে চায়' তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, 'ওই জানালার পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা'। সে গানটির একাল পর্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্য হয়েছে। তার উত্তরে সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে যে গান করতেন 'তুমি আছ কোন্ পাড়া' সেটিও প্রাথমিক হাসির গানের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য—

তুমি আছ কোন্ পাড়া তোমার পাই নে যে সাড়া
পথের মধ্যে হাঁ করে যে রৈলে হে খাড়া।…
রাঙা অধর নয়ন কালো ভরা পেটেই লাগে ভালো
এখন পেটের মধ্যে নাড়িগুলো দিয়েছে তাড়া।

এই সুরেই আবার পরে 'আঃ বেঁচেছি এখন' গানটি রচিত হয়।

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া : পুনশ্চ

গগনদাদা খুব ভালো অভিনয় করতেন বলে দস্যু রত্নাকর যখন বাল্মীকিতে পরিণত হলেন তাঁর তখনকার মনোভাবের উপযুক্ত এক নতুন সঙ্গীর প্রবর্তন করে রবিকাকা গগনদাদাকে সেই ভূমিকা দিলেন। এখন 'এ কেমন হল মন আমার' করুণ গানটি গাইতে গাইতে দিনু গগনদাদার কাঁধে হাত দিয়ে নিজেরই ভাবে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সেও যেমন কাঁদে গগনদাদাও তেমনি কাঁদেন। অভিনয় করতে করতে ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতা যদি একেবারে অভিন্নহৃদয় হয়ে পড়েন তবে তো অভিনয় করা মুশকিল হয়।

আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হিসাবে বলি, আমি ও উষাদিদি কালমৃগয়ায় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গিতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি। আগে কোনো ইংরিজি লেখায় বলেছি 'Either on or off the stage' আমি কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারি নে।

রাজা ও রানী

রাজা ও রানী (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯) নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে; কলকাতার সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের লাগাও জমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। তাকে লোকে বলত বির্জিতলাও। তারই সামনে বর্তমান প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমিতে বিজ্‌নি-রাজার একটি পুরনো বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এইরকম—

বিক্রম	রবিকাকা
সুমিত্রা	মা

দেবদত্ত বাবা
নারায়ণী কাকিমা : মৃণালিনী দেবী

মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য, বাবা এ-সব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মনে হয় এই অভিনয়েই 'উনি' কুমার, এবং প্রতিভাদিদি ইলা সেজেছিলেন।

মায়ার খেলা

মায়ার খেলার একটি অভিনয় এই বির্জিতলার বাড়ির বারান্দাতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, মায়াকুমারীদের অভাবে রবিকাকা জ্যোতিকাকা বসন্ত ও মদন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি এইবার শান্তা সেজেছিলুম।

মায়ার খেলার নাম করতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। অনেকেই জানেন যে রবিকাকা শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে সখিসমিতির সাহায্যার্থে এই গীতিনাটিকা রচনা করেন। বেথুন কলেজের প্রশস্ত আঙিনায় এর প্রথম অভিনয় হয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেন। সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক আলো জলছিল আর নিবছিল, বোধ হয় বিলিতি পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতি অনুকরণটাই প্রবল ছিল। তার পরে মায়ার খেলা কত উপলক্ষে কত ভিন্ন দল দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তবু সে প্রথমের মোহ কাটে না। এখনো মনে পড়ে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তেতলার ঘরে রবিকাকা একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে স্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন। সে সময়ে কিছুদিনের জন্য তিনি কাকিমা ও বেলাকে নিয়ে আমাদের ওখানে এসে ছিলেন। তখন ওঁরা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছেন এবং আমাকে আনতে লরেটো স্কুলে যে গাড়ি যেত তাতে বেলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— আমি কখনো ভুলব না যে গাড়িতে উঠতে গিয়ে, সেই আপেল ফলের মতো রাঙা টুকটুকে গাল ও কোঁকড়া চুল -ওয়ালা পুতুলটিকে হঠাৎ দেখে আমার কী অপ্রত্যাশিত আনন্দই না হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সরলাদিদি-সম্পাদিত ভারতীর সাহায্যার্থে রবিকাকার নির্দেশে জোড়াসাঁকোর বাড়ির লোকেরা অভিনয় করে টাকা তুলে দেন। তার মধ্যে অমিয়া-বউমা প্রমদা সেজে খুব সুন্দর অভিনয় ও গান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে, মায়ার খেলার বিষয়বস্তুটি— অর্থাৎ নায়ক যে শান্ত ভালোবাসা প্রথম জীবন থেকে তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর কাছ থেকে পেয়ে এসেছেন তার মর্যাদা বুঝতে না পেরে তাঁর মানসীর সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ে এক হাস্যোচ্ছল লীলাময়ী নায়িকার রূপে মোহিত হয়ে এবং সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার সেই বাল্যসঙ্গিনীর আশ্রয়ে শান্তি লাভ করেন— রবিকাকা তাঁর নানা কাব্য-নাটকে ব্যবহার করেছেন। কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতিতে এই ঘটনাই পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়িতে এত নাটক অভিনয় হত যে বাইরে নাটক দেখতে যাবার রেওয়াজ ছিল না; কেবল একবার স্টার থিয়েটারে রাজা বসন্তরায় নামে বউঠাকুরানীর হাটের রূপান্তর দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্তরায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।

রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা

আগেই বলেছি আমাদের রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতি অনুকরণে হত। হ. চ. হ.— হরিশ্চন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতি অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়ে দিনুর ঘোড়া নিয়ে স্টেজে ঢোকা, আর 'রিমঝিম' গানের সঙ্গে অরুদাদার টিনের নল ফুটো করে বৃষ্টি নামানোর কথা অবনদাদা তো বলেইছেন। বাইরের থিয়েটারে আমরা কম গেলেও স্টার থিয়েটারে নল-দময়ন্তীর অভিনয়ে এক-একটা 'উইং'-এর গায়ে এক-একজন পরী গোলাপী মোজা পরে কাগজের পদ্মাসনে ত্রিভঙ্গমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে পড়ে।

পরবর্তীকালে আমাদের চোখের সামনেই অবশ্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ বিখ্যাত নটপ্রধানগণকেও বিলিতি নকল ছেড়ে মঞ্চসজ্জায় ভারতশিল্পের প্রবর্তন করতে দেখেছি। মণিলালেরও শুনেছি সখীদের নাচের পোশাকে নতুন ঢঙ প্রবর্তনে অনেকটা হাত ছিল।

পূর্বেই বলেছি ঠাকুরবাড়িতেও মঞ্চসজ্জার প্রথম দিকে বিলিতি অনুকরণই

চলত। রবিকাকার বাল্মীকি সাজে পিঠের দিকে যে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে বিলিতি রাজারাজড়াদের mantle-এর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। অবশ্য রবিকাকা যাই পরতেন তাই মানাত, সে আলাদা কথা। তিনি যখন ঐ সাজে বাল্মীকি রূপে তাঁর সেই সুকণ্ঠে তারসপ্তকে অভিনয়পূর্বক রামপ্রসাদী সুরে গাইতেন 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' তখন যে সেখানে কী অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তা যারা না দেখেছে না শুনেছে তাদের বোঝানো শক্ত।

তখনকার ডাকাতদের কাবুলিওয়ালা-সাজে কেন সাজানো হত বলতে পারি নে। সম্ভবত তাদের ইয়া গোঁফ এবং ইয়া পাগড়ির সমাবেশে ডাকাতের ভীতিজনক রূপ সহজেই ফুটে উঠত। তার পরে আবার মধ্যযুগে তাদের ধুতি, ফতুয়া, হয়তো মাথায় একটা ফেটি বাঁধা, এই সাধারণ বেশ পরানো হত। অবশ্য রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত একটু রঙ চড়িয়ে। লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তো মামুলি পৌরাণিক রীতি অনুসারে লাল ও সাদা জরির বেশে সাজানো হত। বাড়ির মেয়েরাই বনদেবীদের সেলাই-করা জামা পরিয়ে একটি নানা-রঙের শাড়ি ইচ্ছামত জড়িয়ে দিতেন। আর লতাপাতা এবং এলোচুলে ফুল ইত্যাদি দিয়ে বনদেবীদের উপযোগী সাজ করে দিতেন।

আমার ইচ্ছে করে রবিকাকার সংগীতের ধারাবাহিক বিকাশের বিবরণ যেরকম একপ্রকার বাঁধাধরা হয়ে গেছে এবং অনেক জায়গায় উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে তেমনি তাঁর নাট্যসজ্জার বিবরণও কালানুসারে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়। একই নাটক, যথা, বাল্মীকিপ্রতিভার আদ্য মধ্য ও অন্ত -রূপের সজ্জা দেখাতে পারলে আমার এই ইচ্ছাটি সহজেই পূরণ হয়।

নাচ

তখনকার কালে আমাদের অভিনয়ে এত নাচের চল ছিল না। নৃত্যনাট্য দূরে থাকুক, অতি সামান্য ভাবেও কোনো বিশেষ প্রচলিত নৃত্যধারাও শিক্ষা দেবার কোনোরকম কল্পনাই কারো মাথায় আসে নি। বনদেবীদের 'রিমঝিম' প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যে অতি প্রাথমিক ড্রিল-এর মতো একপ্রকার নাচ শেখানো হত, যা দেখে এখনকার নৃত্যপটীয়সীরা বোধ হয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন। ডাকাতদের 'কালী কালী বলো রে আজ'এর সঙ্গে মাথার উপর উঁচু করে ধরে

টিনের তলোয়ার দিয়ে তালে তালে ঠুকে পা ফেলে যে নাচের অনুকরণ করা হত, তাকে কোন্‌দেশী বলা যায় ঠিক জানি নে। আমার, কেন জানি নে, বিলেতে কোনো পল্টনের সাহেব-মেমদের বিয়ের সময় দু পাশ থেকে তুলে ধরা যে তলোয়ারের খিলেনের তলা দিয়ে আসতে হয়, সে দৃশ্যের কথা মনে আসে। কিন্তু সম্ভবত আমাদের দেশের লাঠিখেলার সঙ্গে কিছু যোগ আছে। 'এত রঙ্গ শিখেছ' গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে লাফানোকে কতকটা স্বাভাবিক আনন্দবিকাশের একটা ভঙ্গি মাত্র বলা যেতে পারে। তবে এই-সব নাচের মধ্যেই বোধ হয় রবিকাকার পরবর্তী নৃত্যকলা বিকাশের অঙ্কুর নিহিত। হয়তো পূর্বসংস্কারবশতই আমি অনেক সময়ে বলে থাকি যে, এই নৃত্যকলা অভিনয়কলার গলা টিপে মারছে। অভিনয়কলা মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর বেশি নির্ভর করে, আর নৃত্যকলা হয়তো স্বচ্ছন্দ নৃত্য-ভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে। সকলেই জানেন, রবিকাকা গগনদাদা আর দিনু ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনদাদারও হাস্যরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেজন্য আমার ভয় হয়, পাছে বর্তমানে নৃত্যকলা সেই অভিনয়ের ধারা ব্যাহত করে। অবশ্য ভাবপ্রকাশ নিয়েই কথা, এবং নৃত্যও যে কলার একটি বাহন সে কথা স্বীকার না করে আমি নিজেকে নিতান্ত সেকেলে প্রতিপন্ন করতে চাই নে।

ফাল্গুনী

নাচের কথা যখন উঠলই তখন ফাল্গুনী (প্রথম প্রকাশ ১৯১৬) সম্বন্ধে যেটুকু স্মৃতি আছে বলি। তার প্রথম অভিনয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হয়। নদী চাঁপাবন বেণু প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতীকের যে মানবীয় রূপ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আমার ভাইঝি মঞ্জু প্রভৃতি ছোটোমেয়েদের তত্ত্বাবধান করবার কিছুটা ভার আমার উপর পড়েছিল। আগেই বলেছি, নৃত্যকলার সুষ্ঠু পদ্ধতি তখনো গড়ে ওঠে নি; তার উপর আমি তো এ-সব বিষয়ে নিতান্তই অজ্ঞ ছিলুম। তবু রবিকাকার অনুরোধে যেটুকু পারি ছোটোদের পরিচালনা ও পদচালনা করাবার চেষ্টা করেছিলুম। এ কথা উল্লেখ করছি শুধু জানাবার জন্যে যে, পরে রবিকাকা এই নাচকে 'তোদের ডায়োসিশনের নাচ' বলে একটু খোঁটা দিয়েছিলেন। তাতে আমার গায়ে কিছু লাগে নি, কারণ আমি কোনোদিন

ডায়োসিশনের ছাত্রী ছিলুম না। এখনো মনে আছে, মেয়েদের মাথার মাঝখানে উঁচু ঝুঁটি করে দিয়েছিলুম, যেমন আজও করে থাকে দেখতে পাই। 'নদী আপন বেগে'র সময় মঞ্চের এক দিকে সঞ্জীব আর-এক দিকে নিখিল দাঁড়িয়ে একটা নীল কাপড়কে ঢেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর লেগেছিল, দশ বছরের ছেলে সমরেশ সিংহের ফুলের দোলনায় দুলতে দুলতে 'ওগো দখিন-হাওয়া' গানটি গাওয়া; এ দৃশ্য যারা দেখেছে শুনেছে কখনো ভুলতে পারবে না।

অবনদাদার মঞ্চসজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনো দেওয়া হয়। তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল এবং তার উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা। রথী দিনু ওঁরা নিজে টিকিট বিক্রি করে বোধ হয় দশ-বারো হাজার টাকা তুলেছিলেন, ঠিক কত আমার মনে নেই, কিন্তু তখনকার পক্ষে বেশ ভারী অঙ্ক। অভিনয়ান্তে যখন আমরা উঠোন ছেড়ে দোতলায় উঠলুম এবং দুই বাড়ির মাঝখানে নাম-সার্থক-করা সাঁকোয় দাঁড়িয়ে আছি তখন রবিকাকাকে লক্ষ্য করে বললুম যে তোলা টাকাটা যেন ঠিক হাতে গিয়ে পৌঁছয়। তার উত্তরে তিনি ফাল্গুনীর মাঝির একটি কথা উদ্‌ধৃত করে বললেন, 'আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।' আমাদের অভিনেতা প্রভৃতি সকলকে দোতলার বাইরের ঘরে ভোজ খাওয়ানো হল।

ডাকঘর

ডাকঘরটিও (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) মধ্যপর্বের অন্তর্গত বলে মনে করি। এমন সুন্দর মঞ্চসজ্জা অন্তত আমাদের চোখে তার আগে কখনো পড়ে নি। তখনকার 'বিচিত্রা' ঘরের শেষে মঞ্চটি বাঁধা হয়, ঠিক একটি পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর অনুকরণ ক'রে। সেই চালের খড় পর্যন্ত স্টেজের সামনে থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘরেই ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে কাছাকাছি ছয় বার এই নাটকটি অভিনীত হয়। আমার চোখে ঘরটি এত সুন্দর লেগেছিল যে মনে হয়েছিল কখনো ঘরটি না ভাঙলেই ভালো হয়। তার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রবিকাকা গগনদাদা সমরদাদা অবনদাদা এবং অবনদাদার ছোটো-মেয়ে সুরূপা। আর অমল সেজেছিলেন আশামুকুল নামে একটি শান্তিনিকেতনের

ছেলে ; বহুদিন পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় সে একটি লম্বা কবিতা লিখে অভি-নেতাদের প্রত্যেকের খবর নিয়েছিল। ডাকঘরের অভিনয়ের সুন্দর ছবি তোলা আছে। অবনদাদার অপূর্ব লেখনীতে ছবির চেয়েও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিবিধ

বশীকরণ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গান্ধারীর আবেদনও আমাদের কালে অভিনীত হয়েছিল মনে আছে, এবং তাদের সম্বন্ধে ছোটোখাটো স্মৃতিও যে ভেসে না আসে তা নয়, তবে রবিকাকার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। হয় রবিকাকা কিংবা দিনু পরিচালনা না করলে কোনো নাটক করাই আমাদের সার্থক হত না। একবার আমার বড়োভাশুরের প্ররোচনায় প্রথম মহাযুদ্ধের সাহায্যার্থে আমরা নিজেরা বাল্মীকিপ্রতিভা করবার চেষ্টা করি। তবু রবিকাকাকে অন্তত একবার দেখিয়ে আমাদের ভ্রম সংশোধন করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। সেবার বনদেবীদের সব সবুজ রঙের পোশাক ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে সেই পুরনো বাস্তব নকলের পরিচয়ই দিয়েছিলুম। 'সহে না সহে না' গানটিতে আমরা যেরকম ভাবে বনদেবীদের দলবদ্ধ করে মঞ্চের উপর ইতস্তত বসিয়েছিলুম, তিনি সে পরিকল্পনা বদলে বলে দিলেন, গানটি তাদের মনের আবেগ প্রকাশের উপযোগী করে চড়া করে গাইলে ভালো হয়।

এর পরে, আমি যাকে 'শান্তি'পর্ব বলেছি তখন, অর্থাৎ রবিকাকার শান্তি-নিকেতনে স্থায়ীভাবে বাসকালে তাঁর যে-সব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তার সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তবে ১৯৪১ সালের একেবারে শেষে যখন শান্তিনিকেতনের ভাঙাহাটে স্থায়ীরূপে বাস করতে আসি তখন দুটি পুরনো গীতিনাটিকাকে উদ্ধার করায় আমার কিছু হাত ছিল— কালমৃগয়া আর ভানুসিংহের পদাবলী। ভানুসিংহের পদাবলীর যে অল্পসংখ্যক গান জানতুম, সেগুলিকে সাজিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই নাটিকাটি অভিনীত হয়। কালমৃগয়ার গানও পুরনো ভারতী থেকে আমার মেধাবী ছাত্রী সুচিত্রাকে দিয়ে লিপ্যন্তরিত করেছিলুম। দুঃখের বিষয়, অনেক সাধ্য-সাধনা করেও মগ্নচৈতন্য থেকে সব গানগুলির সুর উদ্ধার করতে পারি নি, তবে অধিকাংশই করেছি।

সাহিত্যস্মৃতি

যেমন গান ও নাটকের বিষয় তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যস্মৃতিও আমাদের ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করতে হয়। ছোটোবেলা থেকেই রবিকাকা আমাদের ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমা করতে দিতেন মনে পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে এ-সব বিষয়ে তিনি আমাদের পরামর্শদাতা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। আমার যখন আন্দাজ ন-বছর বয়স তখন থেকেই অক্ষয় চৌধুরীকে কবিতায় চিঠি লিখতুম, সেগুলি এখন থাকলে কৌতুকের বিষয় হত। আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি পূর্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত। তার মধ্যে রবিকাকার নিজের হাতে কতগুলি নিয়ম লেখা ছিল, যেমন, তার কোনো রচনা বাইরে প্রকাশিত হবে না, ইত্যাদি। এরকম দুখানি খাতা পর পর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন সেটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রবিকাকার স্বহস্তে লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে ছাপার নিষেধটি পরে অবশ্য রক্ষিত হয় নি। আর প্রকাশ করে ভালোই হয়েছে কারণ হাতের অক্ষরের চেয়ে ছাপার অক্ষর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। তা ছাড়া এ লেখার সবগুলির না হোক অনেকগুলির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। আমাদের আত্মীয়বন্ধু অনেকে অনেক ছেলেমানুষি লেখা এতে লিখে গেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমি এতে কখনো কিছু লিখি নি।

রবিকাকা আমাকে উদ্দেশ করে কবিতায় যে-সব পত্র লিখেছিলেন কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) সেগুলি বেরিয়েছিল। তার তিনটি এখনো কড়ি ও কোমলে ছাপা হয়। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় এই তিনটিই কাব্যরত্ন-বিশেষ, আর আমার সঙ্গে তার যোগ স্মরণ করে বিশেষ গৌরব অনুভব করি। আমার জন্মদিনে একটি সুন্দর পিয়ানোর মতো গড়নের দোয়াতদানি উপহার দিয়ে তার সঙ্গে যে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন সেও তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল, এটিও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে ছিল—

স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,

বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে।...

প্রভাতসঙ্গীত (১২৯০) আমাকে 'স্নেহ উপহার' দিয়ে উৎসর্গপত্রে আমার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলেন, প্রথম সংস্করণের বইতে সেটি আছে।

আমি আর-একটু বড়ো হলে আমাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি সাহিত্যস্মৃতির একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। 'ছিন্নপত্র' নামে সেগুলি তাঁর গদ্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন অর্জন করেছে। এই চিঠিগুলির উপলক্ষ হওয়া ছাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুকু আছে যে, সেই অল্পবয়সেই তার মর্যাদা বুঝে তার সাহিত্যিক অংশগুলি সাধারণ পারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি খাতায় তারিখ-সমেত লিখে রেখেছিলুম, পরে সেই খাতা তাঁকেই দিয়েছিলুম। সেই খাতা থেকেই ছিন্নপত্র বইখানি ছাপানো হয়।

রবিকাকার কতকগুলি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ছিল— ভগ্নহৃদয়, নলিনী ইত্যাদি। সেগুলি এখন রবীন্দ্রসদনেই আছে। গত শতাব্দীর শেষ শতকে বিলেতে যাবার সময় ও প্রবাসকালে যে ডায়েরি লিখেছিলেন, তারও নিজের হাতে পেনসিলে লেখা খাতা আমার কাছে ছিল। সেটিও যথারীতি রবীন্দ্রসদনে দিয়েছি। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির খসড়া' নামে সেটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৬-৫৭) মুদ্রিত হয়েছে। এই খসড়ারই সংশোধিত রূপ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড (১৩০০) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছেলেবেলায় আমি আর সুরেন রবিকাকার একটি বিশেষ জন্মদিনে একটি খাতায় আমাদের প্রিয় ইংরেজ কবিদের বিখ্যাত কবিতাগুলি নকল করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। তার নকলের অংশটা আমার হাতের লেখা, কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যে সেয়াইকলমের নকশা করা আছে সেটি আমার দাদার হাতের কারিগরি। তাঁর প্রতি আমাদের ভাইবোনের ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে এই খাতাটি কৌতূহলী যাঁরা তাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে দেখতে পারেন। সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তখন আমাদের নিষ্ঠা, আর শিক্ষাদানের ব্যাপারে রবিকাকার প্রবল উৎসাহের পরিচয় এতে পাওয়া যাবে, কারণ রবীন্দ্রসদনে পৌঁছবার বহু আগে খাতাখানি যখন তাঁর কাছে ছিল তখন তিনি রথীকে দিয়ে আমাদের সংকলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পরবর্তী কবিদের রচনা তাতে নকল করাতে আরম্ভ করেছিলেন। বস্তুত তাঁর সাহচর্য

জ্ঞানদানন্দিনী　সত্যেন্দ্রনাথ　জ্যোতিরিন্দ্রনাথ　কাদম্বরী দেবী

ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিখতুম বলে একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্যা কঁৎদ্‌লীল্, লা ফঁতেন্ প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।

জীবনে অনেক ভালো জিনিস পেয়েছি যা রাখতে পারি নি। তাই বিশেষ করে এটুকু বলে যেতে চাই যে, একমাত্র বইয়ের ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ওঁর সমস্ত ফরাসী গ্রন্থ কাশী বিদ্যালয়কে, আর ক্রমশ সমস্ত সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি বই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। পরে শুনেছি সে বইগুলি শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে রবিকাকা নাকি খুব খুশি হয়ে অনেকদিন নিজের ঘরে রেখেছিলেন।

ছেলেবেলায়ও আমাদের তিনি সে-বয়সের উপযুক্ত ইংরেজি বই জুগিয়েছেন। *Hellen's Babies* (রচয়িতা বিস্মৃত) নামের একটি ছোটোদের বই নিজে পড়ে শোনাতেন। Lewis Caroll-এর *Alice in Wonderland* আর *Through the Looking Glass* -এর মতো অপূর্ব ছোটোদের বই আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসে নি। সেইজন্যই বলি, আজকাল যে নিচু ক্লাসে ইংরেজি ভাষা বাতিল করে দেবার প্রস্তাব উঠেছে সেটা কাজে পরিণত হলে আমাদের শিশুদের আমি 'কৃপাপাত্র অতিদীন' বলে মনে করব।

আর-একটু বড়ো হলে আমরা গুরুজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেখকের বই সমানে পড়ে উপভোগ করেছি। Marie Bashkirtscheff-এর জার্নাল আর এমিয়েলের জার্নাল বোধ হয় তার মধ্যে ছিল। উপন্যাসের মধ্যে মারি করেলি, Onida, জর্জ এলিয়টও আমাদের পঠনীয় পুস্তকের তালিকায় ছিল। ডিকেন্স, থ্যাকারে, স্কট অবশ্য লাইব্রেরি সাজানোর কাজ করেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের দুই-একটা বই ছাড়া বেশি পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এডগার এলেন পো'র সঙ্গে রবিকাকাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর বইয়ের একটি মোটা সংস্করণের চেহারা এখনো পরিষ্কার

মনে পড়ে। তাঁর গদ্যপদ্যের বিশেষত্ব এখনো মনে লেগে রয়েছে। তাঁর গল্পের মধ্যে কী-একটা রহস্যময়তা ছিল। বিশেষত তাঁর The Raven নামের অপূর্ব কবিতাটি ছন্দ মিল ও ভাবের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও স্মৃতির দুয়ারে মাঝে মাঝে আঘাত করে—

While I nodded nearly napping,
suddenly there came a tapping
As of some one gently rapping—
rapping at my chamber door,
''Tis some visitor,' I muttered,
'tapping at my chamber door :
Only this, and nothing more.'
Ah, distinctly I remember it was in
the bleak December,
And each separate dying ember wrought
its ghost upon the floor.

এর পর একটি দীর্ঘ কবিতার প্রত্যেক কলিতে ভাষার দিক থেকে অজস্র মিল সুর ও ছন্দের নকশাটি অব্যাহত রেখে আর ভাবের দিক থেকে সেই নির্জন শীতের রাত্রে একটি কালো পাখির আচমকা আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁর প্রণয়িনী লেনোরের স্মৃতি জড়িত করে কী সুন্দর রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে কবি এই কথা-ক'টি দিয়ে শেষ করেছেন—

And the Raven, never flitting, still is sitting,
still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above
my chamber door :
And his eyes have all the seeming of a demon's
that is dreaming,
And the lamplight o'er him streaming throws
his shadow on the floor :
And my soul from out that shadow that lies
floating on the floor.
Shall be lifted— nevermore !

আমার অবশ্য তখন থেকেই মাতৃ-অধিকারসূত্রে লব্ধ একটু দুর্বলতা ছিল। তাই উইল্‌কি কলিন্সের 'হোয়াইট ওম্যান' পর্যন্ত আমার লোভনীয় মনে হত। জর্জ এলিয়ট পড়া নিয়ে একটু সামান্য ঘটনা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বোম্বাই প্রদেশ বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল বলে আমরা প্রত্যেক ছুটিতে তাঁর কাছে যেতুম। সেরকম একটি সফরের পথে সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোর চট্টোপাধ্যায় আমাদের গাড়িতে এসে ওঠেন। এখনো তাঁর সেই লম্বা সাদা চাপকান আর পাগড়ি -পরা হায়দরাবাদী ঢঙের বেশ, লম্বা দাড়ি আর দীর্ঘ চেহারা মনে পড়ছে। আমার তখন বছর-বারো আন্দাজ বয়স হবে। বোম্বাই-যাত্রার দীর্ঘপথে সময় কাটাবার জন্য বই পড়াই আমার একটি প্রধান অবলম্বন ছিল। সুরেন জানলায় মুখ বের করে চোখে কয়লা ঢোকা সত্ত্বেও বাইরের দৃশ্য দেখতে ভালোবাসতেন। অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কী পড়ছি। আমি জর্জ এলিয়টের 'মিল অন্ দি ফ্লস' বইখানির নাম করতে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হল, যেন আমার বয়সে তার মর্মগ্রহণ করতে পারার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান, যেমন কেউ কেউ উলটো করে বই ধরে বোঝাতে চায় যে সে পড়ছে। তার পরে তিনি তাঁর বাক্স খুলে পুঁতির লাঠি প্রভৃতি হায়দরাবাদের কারুকাজ-করা অনেকগুলি খেলনা দুই ভাইবোনকে দিলেন। আর আমাদের কাছে গল্প করলেন যে আমার বয়সী তাঁর একটি মেয়ে বিলেতে আছে, সে খুব লেখাপড়া ভালোবাসে বলে নিজাম তাকে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর পরে, অনেক পরে, সরোজিনীর সঙ্গে ওঁর বিলেতে দেখা হয়। কিন্তু এহ বাহ্য।

রবিকাকার কাব্যের সঙ্গে পরিচয় অবশ্য পূর্বোক্ত নাটকগুলি বাদ দিলে অনেক পরে আরম্ভ হয়। আমার শ্বশুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং পরে কুটুম্বিতা আর ঘনিষ্ঠতার কথা অন্যত্র বলেছি। শুনেছি কড়ি ও কোমল প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ তিনি বড়ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে করতেন। তাঁর প্রথম রচিত কবিতাবলীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় ছিল না, তা বলতে পারি নে। তার প্রমাণ, পরে আমি একটি খাতায় তাঁর কবিতার মধ্যে আমার প্রিয় কবিতাগুলির একটি সঞ্চয়িতা লিখে রেখেছি। আমার মনে হয়, কড়ি ও কোমল থেকেই তাঁর কবিপ্রতিভার মর্ম সত্যিই বুঝতে আরম্ভ করেছি। ক্রমে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীতে

প্রকাশিত বইগুলির সঙ্গেই যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছি। বিংশ শতাব্দী থেকেই যেন জীবনে একটা বড়ো ছেদ পড়ে যায়। আমারও বিয়ে হয়ে যায় আর রবিকাকাও শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করায় একটু দূরে সরে যান।

সংগীত ও নাট্য -স্মৃতির মতো এ ক্ষেত্রেও আশেপাশের লোকের স্মৃতি অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত আছে। কারণ যদিও আমাদের শাস্ত্রমতে মানুষ একাই সংসারে আসে একাই যায়, কিন্তু ইতিমধ্যে যতদিন সে সংসারে বাস করে ততদিন আর-পাঁচজনকে নিয়েই তার জীবনের জাল গ্রথিত হয়। অক্ষয় চৌধুরী -দম্পতির স্মৃতি অন্যত্র শরৎকুমারী চৌধুরানীর গ্রন্থাবলীর আলোচনায় কিছু কিছু লিখেছি। সেই অতি অল্পবয়সেও অক্ষয়বাবু আমার মতো ছেলেমানুষকে যত্ন করে গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে কবিতা পড়ে আমায় বুঝিয়ে দিতেন। বিশেষত The Bridge of Sighs কবিতাটির প্রথম লাইন One more unfortunate তখন বুঝতে পারি নি এবং এখন ভাবতে গেলে মনে হয় সে-বয়সে সে-কবিতার সবটাই আমি বুঝতে অক্ষম ছিলুম। টমাস হুড-এর Song of the Shirt-ও মনে পড়ে। এমন-কি, গোল্ডেন ট্রেজারির সেই বিশেষ সংস্করণের প্রতিও মায়া পড়ে গেছে। মানুষের ছেলেবেলার স্মৃতির আশ্চর্য প্রভাব, সকলেই নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন। অক্ষয়বাবু, সুরেন ও আমাকে আমাদের বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত ওথেলো পড়াতে পড়াতে নিজেই কিরকম কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন সে কথাও অন্যত্র বলেছি। এই দুই অসমবয়স্ক বাল্যবন্ধুর প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে গেলুম।

এখানে বাবা-মা'র প্রভাবের কথা উল্লেখ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় এই কারণে যে, তাঁরাও শুধু সাধারণভাবে ইস্কুলের পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বাবা-মায়ের কর্তব্যপালন শেষ করেন নি, পরন্তু জন্মাবধি সাহিত্যে আমাদের উৎসাহ ও রুচির গোড়াপত্তন করে দিয়েছেন। এখনো মনে পড়ে, বানিয়নের *Pilgrim's Progress, Arabian Nights,* Grimms আর Hans Anderson -এর রূপকথা, Cervantes-এর *Don Quixote*-এর কী সুন্দর রাজ-সংস্করণ বাবা আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর মা আমাদের নিয়ে বছরখানেক সিমলে পাহাড়ে ছিলেন। তখন আমার বোধ হয় সাত বছর বয়স। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে— মনে করে

নিজেই আশ্চর্য হই, সেই বয়সেই মা আমাদের শেলির Sensitive Plant আর The Cloud, টেনিসনের May Queen আর The Brook পড়াতেন, কারণ এই কবিতাগুলি তিনি ভালোবাসতেন। তার মর্ম কী বুঝতাম ভগবানই জানেন। কিন্তু নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে সে সুন্দর ছন্দোবন্ধের মাধুর্য শিশুমনে প্রবেশ করেছিল, আনন্দ দিয়েছিল। শিক্ষাসম্বন্ধে মায়ের নিজস্ব কতকগুলি মত ছিল, তাই তিনি বাংলায় অক্ষরপরিচয় না করিয়েই কোলে বসিয়ে একেবারেই ভারতী পত্রিকা থেকে পড়িয়ে যেতেন। আর আঁকাবাঁকা অক্ষরে আমারই সমবয়সী উষাদিদি সুপ্রভাদিদি প্রভৃতি বোনেদের চিঠি লেখাতেন। তার নীচে লেখা থাকত 'তুমি আমার চুমু নিয়ো'। এখনো আমার নাতিনাতনীরা যখন 'Home They Brought Her Warrior Dead' চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে, তখন স্মৃতির শততন্ত্রীর একটি ক্ষুদ্র তারে অনুরণন ওঠে। আর নিজেকে এইজন্যে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে, ছোটোবেলায় কিছুকাল বিলেতে থাকার ফলে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণের বন্ধুর পথ তাদের মতো কষ্ট করে অতিক্রম করতে হয় নি।

আর-একটি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত কবি অর্থাৎ টমাস মূরের লেখা 'লাল্লা রুখ' কাব্য মায়ের এবং সেই কারণে আমাদের খুব প্রিয় ছিল। তাঁর Paradise and the Peri প্রভৃতি কবিতা আমাদের সেকালে আনন্দ দিয়েছে, তার সাক্ষী এখানে দিয়ে গেলুম। এখনো ইচ্ছা আছে Lallah Rookh-এর সুন্দর গল্পটি মূক অভিনয় করাতে। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই 'হায় রে দুরাশা'র পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর-কিছু করার নেই। রবিকাকাদের আমলে তাঁদের উপরে টমাস মূরের গান ও কবিতার প্রভাবের কথা অন্যত্র বলেছি।

মূরের এই দুটি লাইন—

> The young May moon is beaming, Love !
> The glowworm's lamp is gleaming, Love !

তাঁরা এইভাবে অনুবাদ করেছিলেন—

> জ্যোৎস্না ফুটফুট, প্রিয়ে !
> জোনাকি মিট্‌মিট্‌, প্রিয়ে !

এডুইন আর্নল্ডের *Light of Asia*ও আমাদের খুব প্রিয় ছিল। এঁরা সেই দলের ইংরেজের মধ্যে, যাঁরা কেবলমাত্র বিজেতার রূপে গর্বে উদ্ধত না

হয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতি ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। আমাদের ছেলেবেলায় Col. Meadows Taylor নামে একজন লেখকের রচিত *Tara* এবং *Sita* উপন্যাস দুটি খুব পড়তুম। শ্লিমান সাহেব নামে আর-একজন সৈনিক ঠগীর দল সম্বন্ধে কিছু বই লিখেছিলেন। সেগুলি এক সময়ে আমাদের পাঠ্য ছিল। জানি নে এখনকার ছেলেরা সেই গলায় ফাঁস দিয়ে মানুষ-মারা দলের নামের সঙ্গে পরিচিত কি না। কেন জানি নে, সেনাবিভাগের একাধিক ইংরেজ কর্তা আমাদের দেশের সংগীত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। বোধ হয় শান্তির সময়ে তাঁদের জীবনের নিত্যকর্মের অভাববশত নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে যে দেশে বাস করছেন তার সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার চর্চা করবার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

যদিও সিমলা পাহাড়ের উল্লিখিত পর্বের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ যোগ ছিল না তবু বাপ-মায়ের অপরিমিত স্নেহযত্ন -স্মরণার্থে এইটুকু লিখলুম।

সিমলা থেকে নেমে এলে সেই যে বছর-আষ্টেক বয়সের পর কলকাতার স্কুলে ভর্তি হলুম তখন থেকে প্রায় তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত রবিকাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমাদের সাহিত্যজীবনকে গড়ে তুলেছিল, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমরা যা-কিছু করেছি, হয়েছি, এমন-কি, ভেবেছি পর্যন্ত— তা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন। ছেলেবেলায় বিলেত যাওয়া আর ইংরেজি স্কুলে পড়ার দরুন, সত্যিকথা বলতে গেলে, আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অতি কাঁচাই থেকে যেত যদি-না তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সংস্পর্শ পেতুম।

সবুজ পত্রের যুগ আমার বিয়ের পরবর্তীকালের হলেও রবিকাকার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সবুজ পত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পাদক তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন—

'আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। এই বোটেই মণিলালের কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ বলেন আর লিখবেন না। তিনি ঢের লিখেছেন। তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বের করে তা হলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম— আপনি যদি লেখেন তো আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিনি বললেন— অন্য কোনো কাগজে আমি লিখব না।

'মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজ পত্র নামে ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ১৩২১ সালের বৈশাখে সবুজ পত্র প্রথম বেরয়।'

সবুজ সভার সভ্যগণ হপ্তায় একদিন করে আমাদের কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনো সাহিত্যালোচনা কখনো সংগীতচর্চা হত। শুনতে পাই যে, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এসরাজ বাজাতেন, কিন্তু আমি তাঁর এসরাজ কখনো শুনি নি। মণ্টু যখন আসত, সে গান করত। বাড়ির মেয়েরাও কখনো কখনো করত। আমরা বাড়ির মেয়েরা, বলা বাহুল্য, সাধারণত রবিকাকার গানই করতুম। রমার মুখে 'এই যে কালো মাটির বাসা' আর 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে', অপুর মুখে 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' আর 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' গানগুলি শুনতে লোকের খুবই ভালো লাগত। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এই রকম এক আসরে 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' গানটি শুনে বলেছিলেন, 'রবিবাবু গীতাঞ্জলির জন্য একবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, এই গানটির জন্য তাঁকে আর-একবার প্রাইজ দেওয়া উচিত।' রবিকাকা যখন কলকাতায় আসতেন তখন মাঝে মাঝে এই আসরে উপস্থিত থাকতেন। সবুজ পত্র -সম্পাদক আরো বলেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না করে সবুজ পত্রের কোনো সংখ্যাই বেরয় নি। এবং তাঁর এই সাহচর্য না পেলে যে আমি ছয় মাসও সবুজ পত্র চালাতে পারতুম না, সে কথা বলাই বাহুল্য। মণিলাল রবীন্দ্রনাথকে বলেন যে, "আপনার সবুজ পত্রের লেখার সঙ্গে অন্য লেখার এত তফাত যে অন্য কোনো কাগজে আপনার লেখা দিলে তার তেমন সমাদর হবে না।" রবীন্দ্রনাথ এ কথা সমর্থন করেন।'

আমার কেবল মনে হয় যে রবিকাকার মতো লেখকের দুর্লভ সাহায্য পেয়ে তবু যে উনি আরো কিছুদিন কাগজটা চালাতে পারলেন না, সে অনেকটা বৈষয়িক সুপরিচালনার অভাবে। যে কারণেই হোক, অত শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়োই পরিতাপের বিষয়। তবে এই মাত্র সান্ত্বনা যে যতদিন চলেছিল সুনাম রেখে গেছে, যার সৌরভ ও গৌরব একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। আমার

দিক থেকে বলবার আছে যে, আমার যেটুকু রচনাশৈলীর শিক্ষা হয়েছে সে ঐ সবুজ পত্রেরই দৌলতে। ১৯০২ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুঘটিত কাঠ-খোট্টা রচনার পর এই দশ-বারো বছরের সঙ্গগুণে বা যে কারণেই হোক, আমার লেখার যে উন্নতি হয়েছিল তার ফলে আমার সবুজ পত্রে লেখা প্রবন্ধ-সংগ্রহ সবে-ধন-নীলমণি 'নারীর উক্তি' বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল।

আমার সাহিত্যস্মৃতি সম্পূর্ণ করতে হলে রবিকাকার রচনার ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখও করতে হয়। তাঁর গুটিকতক কবিতা ও গান আমি তর্জমা করেছি, যা পড়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন। মনে আছে, সংক্ষেপ করার জন্য জনগণমনের দুটি স্তবক বাদ দেওয়ায় তিনি আপত্তি করেছিলেন। গদ্যের মধ্যে জাপানযাত্রী আর কয়েকটি গল্প আমি অনুবাদ করেছি। সুরেনও এ-বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কাব্যের সঙ্গে শিল্প স্বভাবতই জড়িত। কিন্তু রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্প-লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেছেন, কাজেই আমার সে-বিষয়ে ছেলেবেলাকার বিশেষ কোনো স্মৃতি নেই। তবে তাঁর যে আঁকবার হাত আছে তার পরিচয় আমরা ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি। জ্যোতিকাকামশায়ের মতো পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকায় পারদর্শী না হলেও আর অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারো কারো ছবি এঁকেছেন বলে মনে পড়ে। ১৮৯২ সালে আমরা কিছু দীর্ঘ দিন ধরে সিমলে পাহাড়ে থাকি। সেই সময় কলকাতার ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির বাড়ির সঙ্গে সিমলের উডফিল্ড বাড়ির যে হেঁয়ালিচিত্র-বিনিময় চলত তার নমুনা এখনো রবীন্দ্রসদনে আছে। তাতে জোড়াসাঁকোর পক্ষে ছিলেন রবিকাকা গগনদাদা অবনদাদা প্রভৃতি মহারথীরা। আর পাহাড়ী-পক্ষে ছিলেন জ্যোতিকাকা আর সুরেনদাদা। সেই অল্পবয়স থেকেই তাঁদের অতি সাধারণ জিনিস আঁকবারও কী সুন্দর কায়দা ছিল। রবিকাকার হাতেরও কতগুলি হেঁয়ালিচিত্র এতে আছে। হেঁয়ালিরচনাতেও তাঁর স্বাভাবিক মৌলিকতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি এই-সব পেনসিলে আঁকা ছবিতেও তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রকলাসাধনার সংকেত ধরা পড়ে।

আমি আগে বোধ হয় বলেছি যে, জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর আর ৬ নম্বরের

দুই বাড়ি সরস্বতীর চিত্রকলা আর সংগীতকলার দুই দিক ভাগ করে *নিয়েছিলেন।* ৬ নম্বর বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটা গান গাইতে পারতেন না তা নয়, তেমনি ৫ নম্বরেও প্রত্যেকেই ছোটোবেলা থেকে রেখার আঁচড় আর রঙের পোঁচ দিতে পারতেন। তবে সেই সীমারেখা এমন দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না যে এপাশ থেকে ওপাশে একেবারে যাওয়া চলত না। যেমন সত্যদাদাও কিছু কিছু ছবি আঁকতেন আর অবনদাদাও কিছু কিছু গানবাজনা করতেন। রবিকাকা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; তাঁর চিত্রকলার সাধনা অবশ্য কিছু দেরিতে প্রকাশ পেয়েছে।

জানি নে কোন্ সূত্রে, কিন্তু বৃহৎ পরিবারের ভিতর ভাইয়েদের মধ্যে রবিকাকা ও জ্যোতিকাকামশায়ের এবং বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমার সঙ্গে বাবার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতিকাকামশায় ছেলেবেলায় মায়েদের সঙ্গে বোম্বাই চলে যান এবং রবিকাকাও তো বাবার সঙ্গে বিলেত যান। সেইখান থেকেই আমাদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। যখন যা আবদার করতুম সবই তিনি পূরণ করতেন। একবার মনে আছে হাজারিবাগ কনভেণ্টে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে ধরি।

দেশে শাসক-সম্প্রদায়ের মতো কনভেণ্টেও নান্‌দেরও মাঝে মাঝে বদলি করা হত, কেন জানি নে। পাছে কোনো এক জায়গায় মায়াবদ্ধ হয়ে পড়েন, সেই ভয়ে সম্ভবত। সেইভাবে Sister Aloysiaকে হাজারিবাগ কনভেণ্টে বদলি করা হয়েছিল। সে বাড়িটা শুনেছি কবি কামিনী রায়ের স্বামী কেদার রায়ের বাড়ি ছিল। রবিকা বলবামাত্র আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হলেন। হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে পুশপুশ গাড়ি করে বাকি পথটা যেতে হত। পুশপুশ একরকম বড়োগোছ মানুষ-ঠেলা পালকি-গাড়ি বলা যেতে পারে, তাতে শোওয়াও চলে। রাত্রিবেলা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া খুব নিরাপদ ছিল না, কারণ বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। যদিও আমাদের সে রকম কোনো বিপদ ভাগ্যে ঘটে নি। হাজারিবাগ পৌঁছে বোধ হয় ডাক-বাংলোতেই আশ্রয় নিয়েছিলুম। এখনো পুরনো বালক মাসিকপত্রের পাতা উলটালে সেই ডাকবাংলোর হাতায় ইজিচেয়ারের উপর পা তুলে দেওয়া রবিকা'র একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য আর্টিস্টের আঁকা চেহারাটি যে রবিকা'র সেটি ধরে নিতে হবে। আমার একটু একটু মনে পড়ে যেন আমরা কোনো যাদুগোপাল মুখুজ্জের বাড়ি উঠেছিলুম। আমি অবশ্য আমার প্রিয় শিক্ষয়িত্রীকে দেখতে কনভেণ্টে যাত্রা করলুম— মনে হয় তাঁর জন্য কিছু উপহারও নিয়ে গিয়েছিলুম। আমার নিষ্ঠা দেখে নিশ্চয়ই তিনি খুশি হয়েছিলেন; ছ দিন মাত্র বোধ হয় সেখানে ছিলুম, তার পরে যে পথে এসেছিলুম সেই পথেই ফিরে গেলুম। এই সপ্তাহব্যাপী কষ্টকর ভ্রমণে যে রবিকা রাজি হয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায় তিনি আমাদের কত স্নেহ

করতেন। আবার মনে হয়, হয়তো ঐ বয়সে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না, সবটাতেই আনন্দ বোধ হয়।

আর-একবার মনে আছে রবিকা'র সঙ্গে মুসৌরী পাহাড়ে যাই। তার পরে সোলাপুরেও রবিকা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কারোয়ারেও ছিলেন, সেখান থেকেই তো বিয়ে করতে কলকাতায় চলে যান। জ্যোতিকাকামশায়ের 'সরোজিনী' জাহাজেও আমরা একত্র ছিলুম। মনে আছে একবার খুব ঝড় হবার উপক্রম হওয়াতে মা রবিকাকার সঙ্গে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। জ্যোতিকাকামশায়ের আঁকবার খাতা তো তাঁর সঙ্গী ছিল। সেই জাহাজে বসেই আমাদের অনেক ছবি এঁকেছিলেন। এখনো তাঁর খাতা কোথাও সঞ্চিত থাকতে পারে। রবিকা'র নানারকম মজার মজার মুখের ভাব দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। আর-একটি নতুন জিনিস করেছিলেন, আলাদা করে কেবল চোখ আঁকা। তার পরে কোনো-এক বইয়ে দেখেছি, একরকম খেলা আছে, তাতে একটা খবরের কাগজের পর্দার আড়ালে একদল বসে এবং প্রত্যেকের চোখের মাঝে একটা গবাক্ষ কাটা থাকে, তাতে চোখ দিয়ে বসতে হয়। পর্দার ওপার থেকে একজন চোখ দেখে কার চোখ চিনতে চেষ্টা করে। খেলাটা আমরা কখনো খেলি নি, একবার খেলে দেখবার চেষ্টা করলে হয়। সেই জাহাজে নদীর হাওয়াতে সুরেনের ও আমার খুব ক্ষিদে পেত এবং ক্রমাগত কুচো গজা ভেজে দেবার জন্যে রান্নাঘরে তাগিদ দিতুম মনে আছে। সেই জাহাজের ব্যবসায়ে তো জ্যোতিকাকামশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। কিন্তু সে কথা বোঝবার বয়স আমাদের তখন হয় নি। এই জাহাজেই আমরা দ্বিপুদাদার বিয়েতে বরিশাল গিয়েছিলুম। পরে সিমলে পাহাড়ে রবিকাকা দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

রবিকাকার প্রথম মেয়ে বেলা হবার পর রবিকা গাজিপুরে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। গাজিপুর তার সুন্দর গোলাপফুল এবং গোলাপজলের জন্য বিখ্যাত বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিখ্যাত হওয়া উচিত তার গরমের জন্য। আর সে শুকনো গরম, যে, নাবার সময় গায়ে জল ঢেলে আর তোয়ালে দিয়ে মোছার আবশ্যক হত না; এমনিই গায়ের জল গায়ে শুকিয়ে যেত। রাত্রিবেলা লোকে বিছানা-বালিশ-ঘাড়ে খুঁজে বেড়াত বাগানে বাইরে কোথায় শুলে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। ভজিয়া নামে বেলার এক খ্যাঁদা দাসী

ছিল। সে অনেক দিন পরে আমার কাছেও কাজ করেছিল। সে আমাকে দিদিয়া বলেই ডাকত। ওদের দেশের এই 'ইয়া' অন্ত, যথা পানিয়া ইত্যাদি, কথাগুলি শুনতে বড়ো মিষ্টি লাগে এবং অনেক হিন্দী গানেই দেখা যায়। গাজিপুরে জ্যোতিকাকামশায়ের শ্বশুর শ্যামলাল গাঙ্গুলিও ছিলেন। মনে আছে তিনি বেগুন মুলো ও বড়ি দিয়ে গুড়-অম্বল রেঁধে রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে কাশী বেড়াতে যেতেন এবং ফিরে এসে খেতেন। ততদিনে বেশ সুন্দরভাবে মজে থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সে রকম সুস্বাদু গুড়-অম্বল তার পরে আর খাই নি, যদিও বেগুন মুলো বড়ি দিয়ে পরে অনেককে রাঁধতে দেখেছি। এঁরই ছোটো ভাই অমৃতলাল গাঙ্গুলি জ্যোতিকাকামশায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিষয়ে দুটি অতি সামান্য স্মৃতি উল্লেখযোগ্য না হলেও বলছি। একটি হচ্ছে যে, তিনি বসতবাড়ির সামনে বেঞ্চিতে বসে মুসলমান দেখলেই বলতেন, 'ওহে, আমাদের পরব কবে?' যেন তিনি তাদেরই একজন। আর-একটা হচ্ছে যে, তিনি পোস্টাপিসে চাকরি করতেন, তাই বৎসরান্তে হিসেব মেলাবার সময় বেশ একটি বড়ো অঙ্কের হিসেবের গরমিল হলেও miscellaneous unforeseen expenses বলে তা মিলিয়ে দিতেন। এই একই স্থলে আমাদের আর-একজন বিশিষ্ট বন্ধু নাকি লিখতেন G.O.K. (God only knows) এবং আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করি— মা লিখতেন বি ব্যয় (বিস্মৃত ব্যয়)।

আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে রবিকাকার থাকা প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে, তিনি একবার দার্জিলিঙ আর তিনধরিয়ায় আমাদের সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। সময়টা ঠিক মনে করতে পারছি নে।

তিনধরিয়াতে আমার বড়োভাশুর একটি চা-বাগানের বাড়ি কিনে তাকে সুন্দর করে বাড়িয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। সেখানে একবার দিনু আর তার স্ত্রী কমলা-বউমার সঙ্গে আমরা দিনকতক বেড়াতে গিয়েছিলুম। রবিকা দার্জিলিঙ যাবেন শুনে তাঁকে আমাদের ওখানে কিছুদিন থেকে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিলুম। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু খুব যে মনের সুখে ছিলেন, তা বলতে পারি নে। বাগানে বেশ ছোট্ট একটি আলাদা ঘর ছিল, সেখানে সকালে তাঁকে নিয়ে বসতুম আর রিপুকর্ম করতে করতে গল্প করতুম, যেমন আমার বাতিক আছে। তিনি বলতেন, পাহাড়ে জায়গা তাঁর তেমন ভালো লাগে না। কারণ চার দিকে পাহাড় ঘিরে থাকে, দৃষ্টিকে বাধা দেয়।

তিনি পছন্দ করেন উন্মুক্ত প্রান্তর— যেমন শান্তিনিকেতনে দেখা যায়, যেখানে দৃষ্টি দিগন্তের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকে যেন এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারে। আমি নিজে এ কথার সার্থকতা বুঝতে পারলুম যখন উদয়নের দোতলার জানলার ধারে বসে কাচের সার্সির ভিতর দিয়ে দেখতে পেলুম যেন বর্ষার ধারা সার বাঁধা সেনাবাহিনীর মতো মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। রবিকা কেবল দু-তিন দিনের জন্য তিনধরিয়ায় থেকে দার্জিলিঙ চলে গেলেন। বোধ হয় সেবারেই আমরা আবার তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙে একটা দোতলা বাড়িতে ছিলুম।

পারিবারিক স্মৃতি

পারিবারিক স্মৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই পরিবারপত্তন বা বিয়ের কথা তুলতে হয়। যশোর জেলা সেকালে ছিল ঠাকুরবংশের ভবিষ্যৎ গৃহিণীদের প্রধান আকর। কারণ সে দেশে ছিল পিরালী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। শুনেছি সেখানকার মেয়েদের রূপেরও সুখ্যাতি ছিল, যদিও পুরনো দাসী পাঠিয়ে তাদের পছন্দে নির্বাচন করে আনা হত। পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুন কাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য, আমরা দুই ভাইবোনেও সে-যাত্রায় বাদ পড়ি নি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম। সেই বোধ হয় আমার জীবনে প্রথম গ্রাম দেখা। পরেও এ-বিষয়ে খুব বেশি অভিজ্ঞতা হয় নি। একটি বড়ো আঙিনার চারি দিকে চারটি আলাদা ঘর নিয়ে বাড়িটি তৈরি। এইখানে একদিন সুরেন ও আমি বাগানে খেলা করছি এমন সময় জ্যোতিকাকামশায় ওঁরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কটা বেজেছে। তার উত্তরে আমি স্বীকার করলুম যে, ঘড়ি দেখতে জানি নে। তখন তাঁরা আমাকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘড়ি দেখতে শেখালেন, সে শিক্ষা আর ভুলি নি। যদিও এই বউ-পরিচয়ের দলে আমরা থাকতুম না, তা হলেও শুনেছি যে তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামে যেখানেই একটু বিবাহযোগ্যা মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু বোধ হয় তখন যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল, কারণ এত খোঁজ করেও বউঠাকুরানীরা মনের মতো কনে খুঁজে পেলেন না। আবার নিতান্ত বালিকা হলেও তো চলবে না। তাই অবশেষে তাঁরা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারী বেণী রায় মশায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যাকেই মনোনীত করলেন। তাঁর বাপের বাড়ির নাম ছিল ভবতারিণী। শ্বশুরবাড়ি এসে তাঁর নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হল, বোধ হয় বরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। রূপে না হলেও গুণে তিনি পরবর্তী জীবনে শ্বশুর-বাড়ির সকলকে আপন করতে পেরেছিলেন, এ কথা সেকালের অনেকেই জানেন।

এই যশোরযাত্রার যে বীজ বপন করা হয় সেটির ফল ফলে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী

ক্রোড়ে প্রথমা কন্যা বেলা

জ্যেষ্ঠাকন্যা-সহ রবীন্দ্রনাথ
উইলিয়াম আর্চার-অঙ্কিত

রবিকা'র বয়স যখন বছর-বাইশেক হবে, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের কারোয়ার বন্দরে ছিলেন। সেখানে থাকতেই বিয়ের জন্যে বাড়ি থেকে তাঁর ডাক পড়ে। আমরা তাতে উপস্থিত ছিলুম না। কিন্তু পরে শুনেছি যে, শুভকার্যে একটি পারিবারিক শোকের ছায়া পড়েছিল; আমার বড়োপিসেমশায় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক ঐ সময়ে জমিদারি পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে মারা যান। এই দুঃখের সংবাদ জ্যোতিকাকা তারযোগে বড়োপিসিমাকে কারোয়ারে পাঠান। তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। অবশ্য প্রকৃত ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ না করে কেবল সংকটাপন্ন অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। সেই শুনে বড়োপিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে মা আর আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। এখনো মনে পড়ে জোড়াসাঁকোর দেউড়িতে নেমে বড়োপিসিমা জ্যোতিকাকামশায় প্রভৃতির নীরব মুখের দিকে দু-একবার চেয়ে কিরকম করে সোজা তেতলার ঘরে উঠে গিয়ে একটি বিছানায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এইজন্যেই রবিকাকার বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি জড়িত নেই। তবে আগেই বলেছি, আমরা কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে যে-সব ভাড়া-বাড়িতে থেকেছি সেখানে জোড়াসাঁকোর আত্মীয়স্বজনদের সব সময়েই যাতায়াত ছিল। আমার মা'ও খুব আত্মীয়বৎসল আর সেবাপরায়ণা ছিলেন।

বেলা যেন মোমের পুতুলটির মতো হয়েছিল। তাকে দেখতে প্রথম দিন যখন বাড়ির ভিতরে গেলুম তখন স্থির করলুম তার দৈনন্দিন জীবনী আমি রোজ লিখব। কিন্তু কয়েকদিনের বেশি সে সংকল্প স্থায়ী হয় নি। উইলিয়ম আর্চার একবার কলকাতায় এসে রঙিন পেনসিল দিয়ে আমাদের অনেকের ছবি এঁকেছিলেন, তার মধ্যে বেলাকে কোলে করে রবিকাকার ছবিটি আশা করি এখনো আছে। বেলা সম্বন্ধে কিছু কিছু অন্যত্র উল্লেখ করেছি। সে বড়ো বয়সেও দেখতে সুন্দরী ছিল। কিন্তু শিশুকালের সেই মোমের পুতুলের মতো সেই গোল মুখশ্রী ক্রমে বদলে গিয়ে মুখখানি যেন লম্বাটে গড়ন হয়ে গিয়েছিল। যাকে মেয়েলি ভাষায় বলে 'আম-দিগ্‌গি'। কাকিমার কথা আগেই বলেছি যে, তিনি স্নেহ-মমতাময় আমুদে মিশুক প্রকৃতির গুণে পরিবারের সকলকে সহজেই আপন করতে পেরেছিলেন। আমার মনে হয় যশোরের মেয়েরাই সাধারণভাবে এই গুণগুলির অধিকারিণী ছিলেন। বিশেষত, রাঁধাবাড়া

সম্বন্ধে কাকিমার খুব শখ ছিল। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরাতেও তা সংক্রামিত হয়েছে। শুনেছি, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আশ্রমের ছেলেদের জন্য আগুন-তাতে রেঁধে-রেঁধেই কাকিমার শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়। আরো শুনেছি রবিকা'র জমিদারি পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহের কুঠিতে থাকাকালে নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি যখন তাঁদের অতিথি হতেন তখন আর কোনো-রকম মিষ্টান্ন না পেয়ে কাকিমা এমন সুন্দর গাজরের হালুয়া তৈরি করতেন যে তাতেই তাঁরা পরিতুষ্ট হয়ে যেতেন। কাকিমার 'রাজা ও রানী' অভিনয়ে যোগ দেবার কথাও আগে বলেছি। রবিকা'র চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে যে পারিবারিক জীবনের সুন্দর ছবি পাওয়া যায়, তার উপর আমার বেশি কিছু বলবার নেই।

রবিকাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বেলা তাঁর রঙ কতক পরিমাণে পেয়েছিল—আমাদের বাবার মতে তদতিরিক্ত। তাঁর নিজের মুখে শুনেছি যে, বিলেতে রথীর খুব handsome বলে নাম ছিল। সেইসঙ্গে শরীরের গঠন আর স্বাস্থ্য ভালো ছিল। লোকে বলে যে, রবিকাকার ছোটোছেলে শমীন্দ্রই বেশি তাঁর মতো দেখতে ছিল। শমী অল্পবয়সেই বিসর্জনের মতো শক্ত নাটকের কবিতাও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারত। দুলে দুলে রবিকাকার উপাসনা করাও নকল করত। হেমলতা বউঠানের কাছে শুনেছি, বাপের টেবিলে বসে নাকি তাঁর মতো লেখক হবার অভিনয় করত। বারো বছর আন্দাজ বয়সে তাকে ছুটির সময়ে রবিকাকা মুঙ্গেরে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। আমি সে সময়ে যদিও উপস্থিত ছিলুম না, কিন্তু অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি, এখানকার সকলে আশা করেছিল যে, তিনি শমীকে নিয়ে ফিরবেন। সে জায়গায় যখন তিনি একা ফিরলেন— সেই মর্মান্তিক দৃশ্য আর তাঁর গভীর শোকের নিঃশব্দ প্রকাশ তাঁদের পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়েছিল। তাঁদের মতে এই শেষ শোকটিই তাঁকে বেশি গুরুতরভাবে বেজেছিল। শমীর রোপিত একটি লতায় তিনি নাকি নিজের হাতে জল দিতেন। সেই কারণে সেদিন পর্যন্ত হেমলতা বউঠান উপাচার্যকে বিশেষ অনুরোধ করে গেছেন যেন সেই লতাটিকে যত্নপূর্বক রক্ষা করা হয়। তার নামে বিদ্যালয়ের একটি বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে শমীন্দ্রকুটীর, তাও অনেকে জানেন।

রবিকাকার পারিবারিক স্মৃতি লিখতে বসে প্রথমেই এ কথা মনে না হয়ে

শমীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি

যায় না যে, অতুল প্রতিভা ও বিশ্বব্যাপী খ্যাতি যিনি পেয়েছিলেন পারিবারিক জীবনে তিনি অনেক দুঃখও পেয়েছিলেন। পাঁচ সন্তানের মধ্যে বড়ো দুই মেয়ে ও কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। সে-সব মর্মভেদী শোক যদিও তিনি বাইরে শান্তভাবে সহ্য করেছেন কিন্তু তাঁর স্নেহপ্রবণ মনে কতটা যে আঘাত লেগেছিল তা কিছুটা অনুমান করতে পারা যায়।

মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে প্রচার করতে উৎসুক ছিলেন। সেইজন্য মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে হিন্দুসমাজের রীতি রক্ষা করে তাঁর সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্তু রবিকাকা সেরকম কোনো পূর্বসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক জীবনেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। বড়ো-ছেলের বিধবাবিয়ে দিয়েছেন, বড়োমেয়ের যে-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দেন সেটি তাঁর কুটুম্বস্বজনের মনঃপূত হয় নি। এই দুটি তৎকালীন সমাজবিরুদ্ধ কাজের জন্য তাঁকে কিছু কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শুনেছি অতিনিকট কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের উপলক্ষে রবিকাকা আর তাঁর পরিবারবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। সেজন্যে জ্যাঠামশায় তাঁর পরিবারের সবার সেই বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই একই কুটুম্ববাড়ির লোক রবিকাকার মেয়ের বিয়েতে যোগ দেন নি। কিন্তু নিকট-আত্মীয়ের এ-সব বিরুদ্ধাচরণ অপ্রিয় হলেও রবিকাকাকে তাঁর অভিপ্রেত কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। শুনেছি, তিনি নাকি নিজেকে ব্রাহ্ম-সমাজের কোনো সম্প্রদায়েরই দলভুক্ত মনে করতেন না। কাজেও তাই প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি নিজে বসে থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে বিজাতে নিকট-আত্মীয়ের বিয়ে দিয়েছেন দেখেছি। অনাত্মীয়দের মধ্যেও এইরকম ভিন্নজাতে রেজিস্ট্রিবিহীন বিয়েতে তিনি আচার্যের কাজ করেছেন। এ-সব গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আপাতত বাদ দিয়ে একটি সামান্য পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করছি। বেলাকে যখন তার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখতে আসে তখন রবিকাকার লালবাড়ির বারান্দায় তাঁদের খাওয়ানো হয়। আমরা মেয়ের দল পাশের ছোটো ঘর থেকে খড়খড়ে তুলে তাঁদের উঁকি মেরে দেখেছিলুম। এতদিন পরে স্বীকার করতে দোষ নেই যে, শরৎ চক্রবর্তী অর্থাৎ রবিকাকার মনোনীত জামাইয়ের চেয়েও তাঁর মেজোভাই ঋষিবরই দেখতে ভালো ছিল। তাই আমরা মনে করেছিলুম যে,

তিনিই আমাদের জামাইবাবু হবেন। পরে অবশ্য ঘটনা অন্যরকম হল। কিন্তু সেজন্যে আমাদের আপসোস করবার কিছু নেই, কারণ শরৎ তাঁদের স্বল্পকালস্থায়ী বিবাহিত জীবনে বেলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এমন-কি, আমার মনে আছে যে, বেলার মৃত্যুর পর তাঁদের ডিহিশ্রীরামপুরের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, বেলার একটি বড়ো ছবির তলায় তিনি মাটিতে শুয়ে বই পড়ছেন। অনেকদিন পরে শুনে দুঃখিত হয়েছিলুম যে, শরৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু অবস্থায় তাঁর মেজোভাইয়ের কাছে মারা যান।

সেজোমেয়ে রানীর বিয়ে হয় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তাঁর আর-এক ভাই শচীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই। সত্যেন্দ্রকে রবিকাকা বিলেতে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। একবার দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এক দলের সঙ্গে সত্যেন্দ্র পশ্চিমে বেড়াতে যান। সেখানে সে সময়ে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। দেশে ফিরে অন্যেরা সে ধাক্কা সামলাতে পারলেও, দুঃখের বিষয়, সত্যেন্দ্র ম্যালিগ্‌নেণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্রমশ যখন রানীর অসুখ ধরা পড়ল তখন শুনেছি নাটোরের মহারাজা তাকে মধুপুরে নিয়ে যান। অমলা দাসের পরিচর্যা আর হাওয়াবদলের গুণে তার বেশ উপকার হয়েছিল। কিন্তু সে উপকার স্থায়ী না হওয়াতে তাকে আরো উন্নতির আশায় রবিকাকা আলমোড়ায় নিয়ে যান। কিছুদিন সেখানে থেকে সেবাশুশ্রূষা করেন। দুর্ভাগ্যবশত তাতেও রোগের কোনো উপশম না হওয়াতে রবিকাকা তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। পাছে অন্য যানবাহনের ঝাঁকানিতে রানীর কষ্ট হয় সেজন্য তিনি রানীকে ডুলিতে চড়িয়ে আলমোড়া থেকে নীচের রেলওয়ে স্টেশনে অতটা পথ সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে আসেন।

জ্যাঠামশায়ের সেজোছেলে নীতীন্দ্রনাথ জনসাধারণে তেমন পরিচিত নন। আমাদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। বিশেষ করে কাকিমার পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। রানী তাঁর খুব স্নেহের পাত্রী ছিল। রানীর জন্মদিন ১১ই মাঘে তাকে কত সুন্দর উপহার দিতেন মনে আছে। মীরার একমাত্র ছেলের নাম যে নীতীন্দ্র রাখা হয়েছিল সে তাঁকেই স্মরণ করে। নীতুদাদার শেষ অসুখ প্রায় কাকিমার শেষ অসুখেরই সমসাময়িক ছিল আর

রবিকাকার লাল বাড়িতে থেকে তিনি তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন। ডাক্তারের মতানুযায়ী সে লোভ যদি সংবরণ করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর অকালমৃত্যু হত না। শেষ মুহূর্তে তিনি 'কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে ছিলাম নিদ্রামগন' এই কীর্তনাঙ্গ গানটি শুনতে চেয়েছিলেন মনে করলে কষ্ট হয়।

ব্যক্তির পরিচয় তার বাইরের চেহারা থেকে প্রথম আরম্ভ হয়। রবিকাকার চেহারা তো ছবিতে ছবিতে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই পুরুষোচিত দীর্ঘাকৃতি এবং যীশুখৃস্টতুল্য মুখাবয়বের প্রতিকৃতি কে না দেখেছে? বোধ হয়, এত ছবি কম মানুষেরই আঁকা বা তোলা হয়েছে। তাঁর সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তীতে, মনে পড়ে, অমল হোম তাঁর যে আলোকচিত্র-প্রদর্শনী করে-ছিলেন তাতে একটা ঘর ভরে গিয়েছিল। তার পরে তো আরো অনেক তোলা হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় তাঁর যে চেহারা মনে পড়ে তাতে তাঁর লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুল দেখা যায়। রাবীন্দ্রিক যুগে অনেক যুবক আবার এই কায়দা অনুকরণ করতেন। যদিও তাঁরা বোধ হয় ভুলে যেতেন যে, লম্বা চুল রাখলেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না। যেমন আমার এক ভাইপোকে ম্যাট্রিকের পড়া মন দিয়ে করে নি বলে বকাবকি করাতে সে কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিল রবীন্দ্রনাথও ম্যাট্রিক পাস করেন নি। তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিক পাস করেন নি বটে কিন্তু ম্যাট্রিক পাস না করলেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।' এরই সমতুল্য একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। সেটি এই যে, শুনেছি আমার সেজোভাগুর কুমুদনাথ চৌধুরীকে কে-একজন বলেছিল যে কার্লাইল পড়ে ইংরিজি শেখা যায় না। তদুত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, কার্লাইল পড়ে ইংরিজি শেখা যায় না, ইংরিজি শিখে কার্লাইল পড়তে হয়।' যাই হোক, পরবর্তীকালে রবিকাকা এই দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ কর্তন করেছিলেন। আমার নিজের ধারণা এই যে, অল্পবয়স অপেক্ষা অধিকবয়সে তাঁর চেহারা আরো ভালো হয়েছিল। দীর্ঘকেশ-দীর্ঘশ্মশ্রুতে তাঁকে ঋষিতুল্য মনে হত। ভাইদের মধ্যে যদিও তাঁর রঙ খুব সাফ ছিল না, এমন-কি, আমার বড়োপিসিমা (সৌদামিনী দেবী) তাঁকে কালো বলতেন, শুনেছি; কিন্তু তাঁর ত্বকের বেশ একটি মসৃণ লালিত্য

ও সুন্দর চেহারা ছিল। অল্পবয়সে ডন ফেলার ব্যায়াম অভ্যাস করতেন বলে শুনেছি। সেকালে কুস্তি প্রভৃতি শরীরচর্চার রেওয়াজ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিল। আবার, এমন গুরুভোজনও ছিল না যাতে শরীর কেবল মেদবহুল হয়ে যায়। খাবার নিয়ে রবিকাকা নানারকম পরীক্ষাও চালাতেন, সেটা অনেকেই জানেন। যথা, রুটিতে রেড়ির তেলের ময়ান দেওয়া, যাতে একাধারে আহার ও ওষুধ হয়। বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসও তাঁর ছিল। যথা, হোমিয়োপ্যাথি এবং বায়োকেমি। নিজে অনেককে ওষুধ দিতেন এবং তাতে উপকার হয়েছে শুনলে খুব খুশি হতেন। কাকিমার শেষ অসুখে এক হোমিয়োপ্যাথি ধরে রইলেন ও কোনো চিকিৎসা বদল করলেন না বলে কোনো কোনো বিশিষ্ট বন্ধুকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। সেবাগুণও যে তাঁর খুব ছিল, তা তাঁর জীবনে ও চিঠিপত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়নাথ সেন। তাঁকে ও অন্য কোনো কোনো বন্ধুকে নিজের বিয়েতে নিমন্ত্রণকর্তারূপে নিজের নামেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। আর-একজন তাঁর কাছে খুব আসতেন, তাঁর নাম প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

রবিকাকার আর-একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকে লিখিত কবিতার পত্রটি এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে আসতে পারে। তাঁর চেহারা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। তাঁর সম্বন্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তাঁর স্ত্রীর নাকি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল— তিনি চোখ বুজে থাকলেও তাঁর চোখের উপর বই রেখে দিলে তা তিনি পড়তে পারতেন। মীরারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে জ্যাঠাইমা বলে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করত। এখনো তাঁর বংশধরদের সঙ্গে আলাপপরিচয় রাখেন। তাঁর বড়োছেলে সন্তোষকে রবিকাকা রথীর সঙ্গে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠান, সে কথা অনেকেই জানেন। তারা ফিরে এসে শিলাইদহের জমিদারিতে তাঁদের কৃষিবিদ্যার কিছু পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমার মনে হয়, রথীর যে বাগান করবার শখ পরবর্তী জীবনে দেখা দেয় সেটি এই বিজ্ঞানচর্চারই আর-এক দিক। এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বংশের ধারাবাহিক শিল্পপ্রবণতার শুভসম্মিলন ঘটেছিল। আমি অনেক সময় বলি যে, বাইবেলে যে বলে, সৃষ্টির প্রথম দিনে ভগবান বললেন let there be light আর অমনি আলো হল, আমাদের মতো
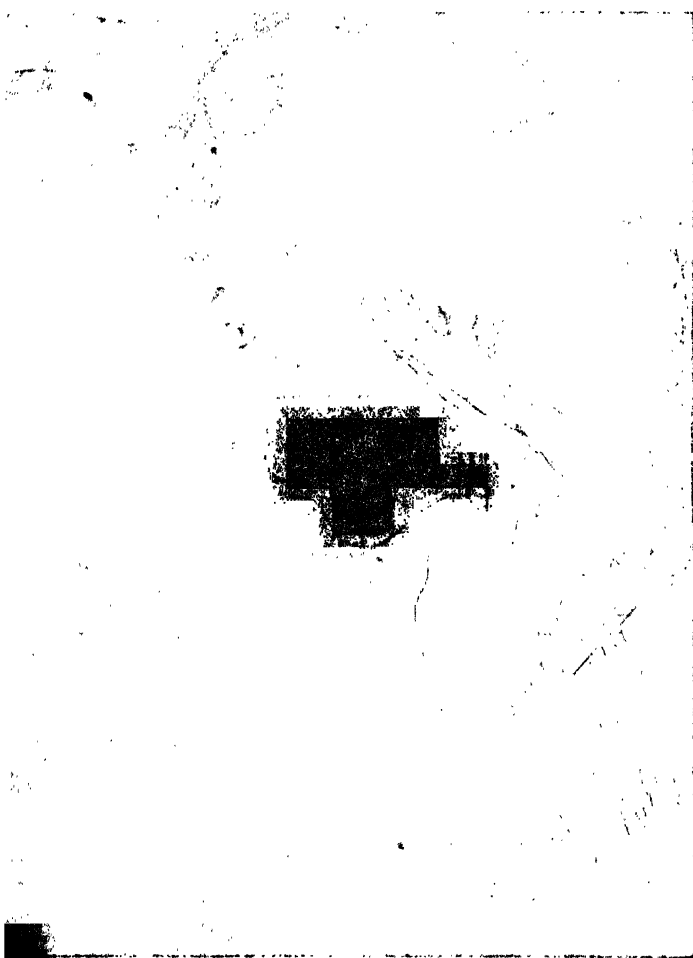
'বিবি'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি

মর্তমানবের পক্ষে অনেক মুখের কথায় কিছু করা সম্ভব হয় না। ইচ্ছামত ফল ফলাতে গেলে তার জন্তে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। রবিকাকারও খুব বাগানের শখ ছিল। কিন্তু তফাতের মধ্যে তিনি হাতে-কলমে সে শখ মেটাতে কোনোদিন চেষ্টা করেন নি। কেবল কবিজনোচিত ভাবে ফুলফলের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। শুনেছি তাঁর 'শান্তিপর্বে' কোণার্ক বাড়িতে যখন ছিলেন তখন তাঁর বারান্দায় বসলে হাতের কাছে প্রকাণ্ড মোটা শিমুলগাছ এবং কিছু দূরের রোগা ঢ্যাঙা পলাশ গাছে যখন বসন্তকালে লাল ফুল দেখা দিত, তখন রবিকাকা যে আনন্দ লাভ করতেন, তা মানুষের পুত্রলাভেও হয় না। তবে এও শুনেছি যে, তাঁর সর্বতোমুখী ক্ষমতার বাস্তব দিক থেকেও ছাত্রদের তিনি চিঠিপত্রে বাগান তৈরি সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নি। তাঁর গানে ও কবিতায় সর্বত্র যেমন যন্ত্রের মধ্যে বীণা ও বাঁশি, তেমনি ফুলের মধ্যে চাঁপা ও বেলফুলের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বর্ষাঋতুর কেয়া আর রজনীগন্ধা ও শরতের শিউলি যে তাঁর গানে-কবিতায় কত আছে, পাঠকমাত্রেই জানেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমরা বেশি থাকতুম না। চৌরঙ্গী অঞ্চলেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি ভাড়া করে থাকতুম। কারণ, পূর্বেই বলেছি, মা সেণ্ট জেভিয়ার্স ও লরেটো স্কুলেই আমাদের ভর্তি করেছিলেন। তবে এই দুই বাড়ির মধ্যে দেখাশোনা আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুর খুব আড্ডা জমত এবং 'প্রমারা' নামে একটি পয়সার খেলা হত। রবিকাকাও সপরিবারে প্রায়ই আসতেন। রথীর আত্মকথায় তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি সে খেলায় যোগদান করতেন না। যতদূর মনে পড়ে, রবিকাকাকে কোনো সাধারণ খেলায় কখনো যোগ দিতে দেখি নি। তবে এরকম খেলায় যোগ না দিলেও তাঁর স্বাভাবিক উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের সঙ্গেও নতুন নতুন খেলায় প্রকাশ পেত। যথা, পাঁচ জনে একত্র বসে মুখে মুখে পালাক্রমে গল্প রচনা করা। 'মেরি সার্কেল' বলে একটা ইংরিজি বই দিয়েছিলেন তাতেও নানারকম ঘরে-বসে খেলার বর্ণনা ছিল।

হেঁয়ালি নাট্যতে পরে যা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন সংক্ষেপে ও ঘরাওভাবে তা খেলাচ্ছলে অভিনয় করা হত। অর্থাৎ, একটা কথাকে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের অভিনয় দেখিয়ে সমস্ত কথাটা দর্শকদের অনুমান করতে বলা হত—

'শারাড্'। এরই একটি ভিন্নরূপ হয়েছে মূকনাট্য বা ডাম্ব্‌শারাড্— অর্থাৎ কেবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারাই কথাটি বোঝানো। যথা, দু হাত দিয়ে দু কান চেপে ধরলে, তার মানে হল 'চাপকান'। এই খেলার এত চল একসময়ে আমাদের মধ্যে হয়েছিল যে, ক্রমাগত পাগলের মতো নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করতে করতে সাধারণ সামাজিক বাক্যালাপ একরকম উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই এ খেলা বন্ধ করা শ্রেয় মনে হল।

কোনো কোনো সময় একত্র বাসও করে গেছেন। যথা, দেশের মধ্যে কারোয়ার, সোলাপুর, সিমলা পাহাড় ইত্যাদি এবং বাড়ির মধ্যে ভবানীপুরের বাড়ি, পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ইত্যাদি। নাট্য ও গানের স্মৃতিতে এ কথার আগেই উল্লেখ করেছি। জ্যোতিকাকামশায়ের 'সরোজিনী' জাহাজে আমাদের একত্র ভ্রমণের কথাও আগেই লিখেছি।

ছোটোবেলায় রবিকাকার সঙ্গে অনেক সভাসমিতিতে ও লোকের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতুম। তার মধ্যে একবার বঙ্কিমবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম; তাঁর সেই খাঁড়ার মতো নাক ও পাতলা ঠোঁট এখনো একটু একটু মনে পড়ে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতি কবি বলে নতুন কাকিমার এত ভক্তি ছিল যে, তিনি নিজের হাতে তাঁর জন্যে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন। সেজন্য রবিকাকা একটু ঈর্ষা বোধ করতেন, নিজেই লিখেছেন। সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে অবিনাশ যখন-তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতর পর্যন্ত আসতেন এবং 'মেজোকাকিমা' 'মেজোকাকিমা' বলে উচ্চৈঃস্বরে মাকে ডাকতেন— বেশ মনে পড়ে। বোধ হয় কবিবংশের একটু ছিটে তাঁরও ছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার কতকগুলি গানে বিহারীলালের প্রভাব পড়েছে সে কথা রবিকাকা নিজেই স্বীকার করেছেন। পরে অবশ্য এই কবিবংশের সঙ্গে রবিকাকা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

—

মানময়ী-প্রসঙ্গ

"একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ ষ্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর-রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু [চৌধুরী] তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন।... এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে মানভঙ্গ [মানময়ী] নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। মানভঙ্গ প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অভিনীত হয়।"

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১৫৭

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়... তিনি শুধু অক্ষয়চন্দ্রের নাম করিয়াছেন, মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও গান রহিয়াছে; যেমন শেষ গান— 'আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি' ইত্যাদি।"

—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬

"মানময়ীর গানগুলি রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর দুইটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।...

১। রতির গান। ছিলে কোথা বল...

২। বসন্তের গান। চল চল, চল চল, চল ফুলধনু..."

—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬

পরিচয়পঞ্জী

অপু। আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরীর কন্যা

অভি। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞা দেবী

অমলা দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী, বিখ্যাত গায়িকা

অরুদাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ

উষাদিদি। দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যা

জগদীশদাদা। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মাতুল

জ্যোৎস্নাদাদা। জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র

দ্বিপুদাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ

নগেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন কাকিমা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী

নিখিল। আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা, মন্মথনাথ চৌধুরীর পুত্র

প্রতিভাদিদি। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা, আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ইনি রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) প্রকাশ করেন

বড়ঠাকুর। আশুতোষ চৌধুরী

বর্ণপিসিমা। মহর্ষির কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী

মঞ্জু। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

মণ্টু। দিলীপকুমার রায়

রমা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

সত্যদাদা। মহর্ষির দৌহিত্র, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সরলাদি। সরলা দেবী চৌধুরানী

সুচিত্রা [মিত্র]। সংগীতভবনের প্রাক্তন ছাত্রী, সুপরিচিতা রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা

সুপ্রভাদিদি। মহর্ষির দৌহিত্রী, শরৎকুমারীর কন্যা

সুশীলাদি। মহর্ষির দৌহিত্রী, শরৎকুমারীর কন্যা

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিরণদিদি। জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা